ট্র্যাজেডি অব সেক্সপীয়ার

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

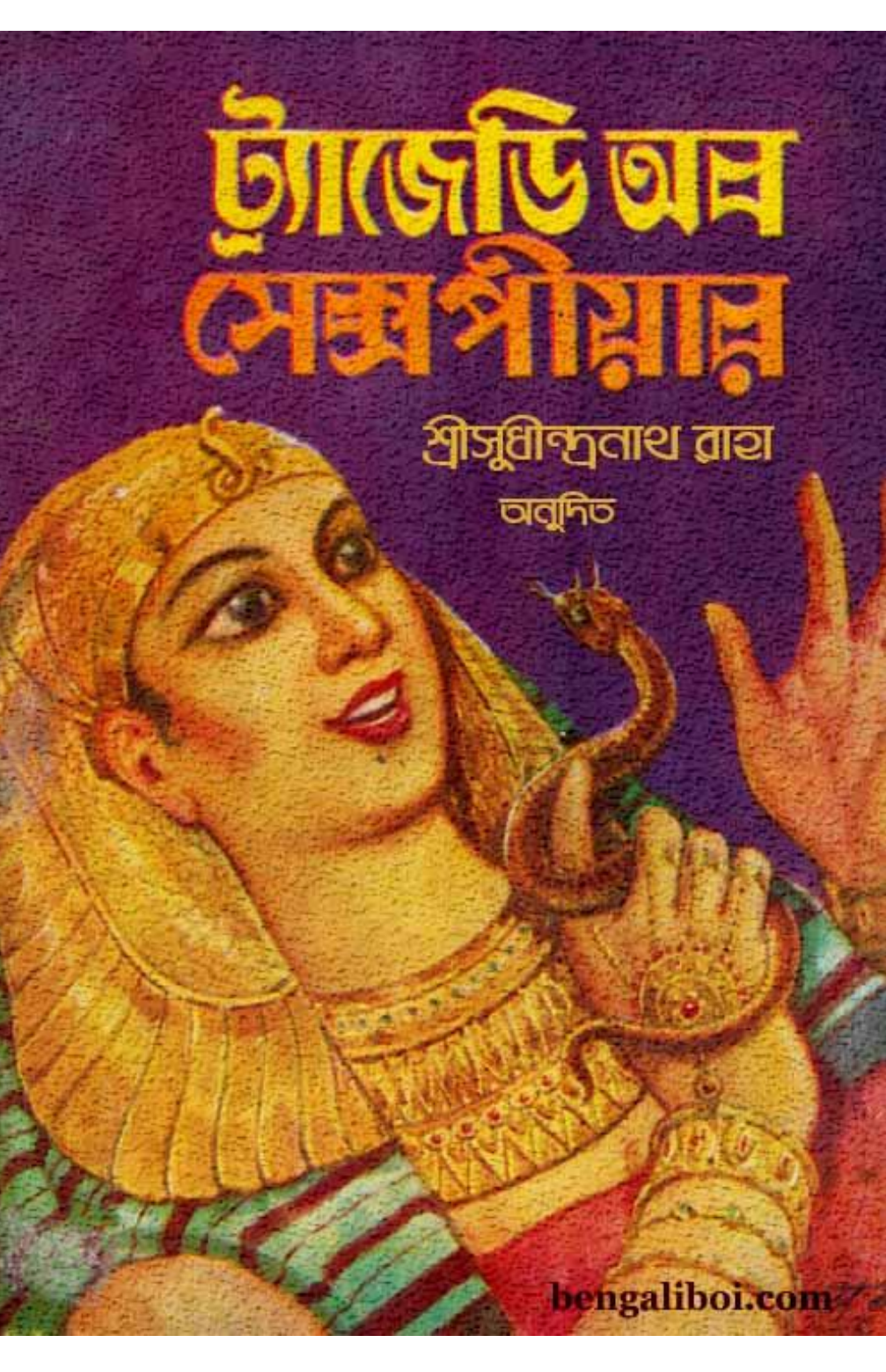

bengaliboi.com

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

অনুবাদ সিরিজ—

ট্র্যাজেডি অব সেক্সপীয়ার

● সেক্সপীয়ার ●

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অনূদিত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

TRAGEDY OF SHAKESPERE
CODE NO. 44 T 25

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

নভেম্বর
১৯৯১
১৪

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

দাম—
টা. ১৬·০০

bengaliboi.com

উপহার

bengaliboi.com

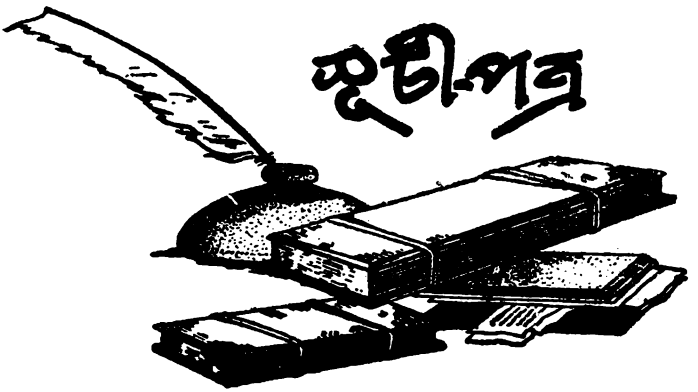

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ম্যাক্‌বেথ	১
২।	রোমিও-জুলিয়েট	২৩
৩।	কিং লীয়ার	৪২
৪।	ওথেলো	৫৮
৫।	রিচার্ড দি থার্ড	৮০
৬।	এ্যাণ্টনি এণ্ড ক্লিওপেট্রা	৯৫
৭।	জুলিয়াস সীজার	১০৮
৮।	হ্যাম্‌লেট্‌	১২৫

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার

অনূদিত

১। লাস্ট ডেজ অব পম্পেঈ

২। ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট

৩। এ টেল অব টু সিটিজ

৪। সেক্সপীয়ারের কমেডি

৫। প্রিন্স এণ্ড দি পপার

৬। রব রয়

bengaliboi.com

লে

খ

ক-প রি চি তি—

ছোট্ট এক নদী, নাম তার আভন।

তারই তীরে স্ট্রাটফোর্ড এক ছোট্ট শহর। আরও ছোট ছিল চারশো বছর আগে। বলতে গেলে তখন একে শহরই বলত না কেউ।

সেই চারশো বছর আগে, ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষুদে শহরটিতে জন্ম হল এমন একটি মানুষের, যাঁর মত প্রতিভাধর সারা পৃথিবীতেই এ-যাবৎ খুব কমই দেখা গিয়েছে। এই আশ্চর্য মানুষটির নাম উইলিয়ম সেক্সপীয়ার। ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় কবি বা নাট্যকার ত বটেই, সারা পৃথিবীর সাহিত্যেও এঁর সমান কবি বা নাট্যকার দু-চারজনের বেশী নেই।

গরিবের ছেলে ছিলেন উইলিয়ম। তবু বাল্যে তিনি মোটামুটি ভাল শিক্ষাই পেয়েছিলেন। কর্মজীবন তাঁর শুরু হয়েছিল পাঠশালার শিক্ষকরূপে। কিন্তু একাজ তাঁকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারে নি। তৃপ্তি পান নি এতে। সদাই মনে হয়েছে—পৃথিবীর মানুষের দেবার মত জিনিস কিছু আছে তাঁর ভিতরে। ক্ষুদে পাঠশালার গণ্ডীর ভিতর বসে থাকলে সে-জিনিস দেবার সুযোগ তিনি কখনও পাবেন না।

মহাকালের ডাক যখন এসে পৌঁছোয়, পাখি আর নীড়ে বসে থাকতে পারে না। সেক্সপীয়ার পাঠশালার নীড় থেকে বেরিয়ে লণ্ডনে এসে পড়লেন। কেউ তাঁকে চেনে না এই মহানগরীতে। জীবিকার খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে আশ্রয় পেলেন এক আস্তাবলে। আস্তাবলটি ছিল এক রঙ্গালয়ের। সেখানে ঘোড়ার তদারক করতে করতেই তিনি কোন এক সুযোগে অভিনেতার দলে ঠাঁই করে নিলেন।

যত-বড় থিয়েটারই হোক, দল বুঝে নাটক না লেখালে তা কখনো ব্যবসার দিক্ দিয়ে সুবিধা করতে পারে না। সেক্সপীয়ারের দলেও ফরমাইশী নাটক লেখানো হত। কিছুদিন বসে হালচাল বুঝে নিয়ে তিনিও লিখে ফেললেন একখানা নাটক। এমনি দীনহীন ভাবে মহানাট্যকারের নাট্যরচনার অভিযান শুরু হল। সকল দেশের সর্বকালের সাহিত্যগগনকে উদ্ভাসিত করে উদয় হল প্রতিভার এক দীপ্ত সূর্য।

বিয়োগান্ত নাটকে আর মিলনান্ত নাটকে সমান দক্ষতা খুব কম নাট্যকারই দেখাতে পারেন। সেক্সপীয়ার দুইয়েতেই অতুলনীয়। নাটক তিনি লিখেছিলেনও ত্রিশখানার উপরে। ঐতিহাসিক, সামাজিক কিছুই তিনি বাদ দেন নি। সবচেয়ে বড় কথা যখন যে-নাটক ধরেছেন, তাঁর লেখনীর গুণে তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে খাঁটী সোনা।

নাটক ছাড়া অনেকগুলি সনেট কবিতা ও দুই একখানি ছোট কাব্যও তিনি লিখেছিলেন। কাব্যসুষমায় সেগুলিও অতুলনীয়।

শেষজীবনে রঙ্গালয় থেকে অবসর নিয়ে সেক্সপীয়ার জন্মস্থান স্ট্রাটফোর্ডে গিয়ে বাস করেন। সেখানেই তাঁর তিরোধান হয় ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতি বৎসর তাঁর জন্মদিনে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত হন—তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য।

———

ম্যাক্‌বেথ

ইংরেজের দেশের উত্তরে বাস করে স্কচ জাতি।

মাত্র শ'-তিনেক বছর ধরে এই দুই জাতি একই রাজার অধীনে বাস করছে। তার আগে ওদের আলাদা রাজ্য ছিল, রাজাও ছিল পৃথক।

ইংরেজের দেশ ইংলণ্ডে রাজা যখন ধার্মিক এডওয়ার্ড, সেই সময় স্কচদের দেশ স্কটল্যাণ্ডে রাজা ছিলেন ডানক্যান। বড় চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। যেমন ছিল তাঁর মিষ্টি ব্যবহার, তেমন ছিল দয়া। প্রজাদের তিনি ভালবাসতেন নিজের সন্তানের মত। কিসে তারা শান্তি-সুখে থাকবে, কেমন করে তাদের অবস্থা ভাল হবে ক্রমশঃ, এছাড়া অন্য চিন্তাই ছিল না তাঁর।

এমন রামরাজ্যেও কিন্তু অশান্তির ঝড় উঠল একদিন।

তাঁর এক 'থেন' সৈন্য সাজিয়ে রাজার বিরুদ্ধে মাথা তুলল।

'থেন' কাদের বলে তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। তখনকার দিনে ইওরোপের সব দেশেই ছিল বড় বড় জমিদার। এদের ক্ষমতা ছিল অসাম। রাজার নিজের অনেক শক্তি থাকলে তবেই এরা

রাজাকে মানতো। তা না হলে তাঁকে অগ্রাহ্য করে নিজেরা জমিদারী শাসন করত একেবারে স্বাধীন ভাবে, নিজেদের খেয়াল-খুশি মত।

স্কচদের দেশেও এ-রকম বড় জমিদার অনেক ছিল, তাদের উপাধি ছিল 'থেন'।

এই 'থেন'দের ভিতর সবচেয়ে বড় ছিলেন 'কডোর'-এর থেন। রাজা ডানক্যানের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করলেন, আর নরওয়ের রাজা 'সোয়েন'কে ডেকে পাঠালেন—স্কটল্যাণ্ডে এসে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য।

সোয়েন তাতে তখনই রাজী। নরওয়ের লোকেরা সে-যুগে দারুণ লড়াইবাজ ছিল। ঠাণ্ডা হয়ে নিজের দেশে বসে থাকতে মোটেই তাদের ভাল লাগত না। জাহাজ নিয়ে তারা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরত আর নানা দেশে আক্রমণ চালিয়ে লুঠতরাজ করত। আর এই আক্রমণের মুখে কোন দেশকে একেবারে অসহায় দেখতে পেলে সে-দেশের বড় বড় অংশ জুড়ে নিজেদের নতুন নতুন রাজ্যও তারা গড়ে তুলত।

'কডোর'-এর থেন বিদ্রোহ করেছে, এ-সময় তার সঙ্গে যোগ দিয়ে স্কটল্যাণ্ড আক্রমণ করলে ওদেশে একটা ওলট-পালট ঘটানো খুবই সম্ভব। তাতে সোয়েন-এর ভাগ্যে ওখানে একটা নতুন রাজ্য জুটে যাওয়াই বা অসম্ভব কি!

সৈন্যবোঝাই নরওয়ের জাহাজ স্কটল্যাণ্ডের দিকে তক্ষুনি রওনা হল।

রাজা ডানক্যান নিজে নিরীহ লোক; ধর্মকর্ম নিয়ে দিন কাটাতে পারলেই তিনি খুশী থাকেন; তা হলেও রাজকর্তব্যে তাঁর ত্রুটি নেই। কডোর-এর থেন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, আর বিদেশীরা এসেছে—তার সাহায্য করবার জন্য, এই খবর পেয়েই তিনি সৈন্য পাঠালেন বিদ্রোহ দমন করে হানাদারগুলোকে সমুদ্রপারে তাড়িয়ে

দেওয়ার জন্য। তাঁর সেনাপতি ছিলেন ম্যাক্‌বেথ আর ব্যাংকো। দুজনেই মহাবীর। ম্যাক্‌বেথ আবার নিজেও একজন বড় জমিদার, গ্লামিসের থেন। বংশের দিক্ দিয়েও তিনি খুব বড়, তাঁর আর রাজার দেহে একই বংশের রক্ত বইছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল।

রাজার পক্ষের সৈন্যদের আগে আগে চলেছেন যুবরাজ ম্যালকম —ডানক্যানের জ্যেষ্ঠপুত্র। সৈন্য চালনা করতে গিয়েই তিনি বাধা পেলেন ম্যাকডোন্‌ওয়াল্ডের কাছে। এ-লোকটা এসেছে আইরিশদের দেশ থেকে—বৃহৎ একদল সৈন্য নিয়ে। কডোর একেও নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছে ডানক্যানের বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে।

এই ম্যাকডোন্‌ওয়াল্ড ভয়ানক যোদ্ধা। ম্যালকম তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলেন। চারদিক থেকে ঘিরে শত্রুরা তাঁকে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগল।

অতি কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে এল তাঁর সৈনিকেরা। কিন্তু তারপর ক্রমেই তারা হটতে থাকল। ম্যাকডোন্‌ওয়াল্ড এগিয়ে আসছে, তার বীরত্বের সমুখে কেউই দাঁড়াতে পারছে না।

এমন সময় এসে পড়লেন ম্যাক্‌বেথ—গ্লামিসের থেন, রাজ-সৈন্যের সেনাপতি। তিনি এতক্ষণ পিছন দিকে ছিলেন। ম্যাকডোন্‌ওয়াল্ডকে কেউ রুখতে পারছে না দেখে তিনি ছুটে এলেন সম্মুখে।

দুই যোদ্ধার ভিতর যে ভীষণ যুদ্ধ হল, তা একটা দেখবার জিনিস। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ম্যাক্‌বেথের তরবারি শত্রুর কণ্ঠ থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে দুই ফালিতে বিভক্ত করে ফেলল। পড়ে গেল দুর্জয় ম্যাকডোন্‌ওয়াল্ড। তার মুণ্ডটি কেটে নিয়ে ম্যাক্‌বেথ পাঠিয়ে দিলেন—প্রথমেই হাতের কাছে যে রাজদুর্গ আছে, তার চূড়ায় বসিয়ে রাখবার জন্য।

সংবাদ নিয়ে তখনই দূত ছুটল রাজা ডানক্যানের প্রাসাদে।

ম্যাক্‌বেথের বীরত্বের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হলেন রাজা। কিন্তু সেই-ই শেষ নয়, দূতের পর দূত আসছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। ম্যাক্‌বেথ জিতছেন, জিতেই চলেছেন।

হঠাৎ একটা খারাপ খবরও এল—নরওয়েরাজ সোয়েন এসে পড়েছেন। কডোর-এর সাথে মিশে ম্যাক্‌বেথকে আক্রমণ করেছেন।

কী-হয় কী-হয়—দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছেন ডানক্যান। এমন সময় আবার খবর এল—ম্যাক্‌বেথ শত্রুসৈন্য ধ্বংস করে এমন জয়লাভ করেছেন যে তাদের আর মাথা তুলবার কোন উপায় নেই। কডোর হয়েছে বন্দী, নরওয়েরাজ দশহাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্ধি করেছেন।

ডানক্যানের আনন্দের আর সীমা নেই। বীর ম্যাক্‌বেথের উপকারের ঋণ কী করে শোধ করবেন, তা আর তিনি ভেবে পান না। তিনি তখনই আদেশ দিলেন—'কডোর-এর থেনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক, আর তার জমিদারি ম্যাক্‌বেথকে দিয়ে তাঁকে করা হোক নতুন "থেন অব্‌ কডোর"।

* * *

একটা পাহাড়-ঘেরা জলা। তার এক পাশ দিয়ে চলে গেছে রাজপথ। জলায় উঠছে কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া, সেই ধোঁয়ার ভিতর আবছা দেখা যায় তিনটি ছায়ামূর্তি। নারীর মত আকৃতি তাদের, কিন্তু মুখে দাড়ি। হাড়-বার-করা মুখ আর গর্তে-ঢোকানো চক্ষু দেখে তাদের এ-মাটির পৃথিবীর জীব বলে ধারণা করা যায় না।

ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে সেই তিন বীভৎস আবছা মূর্তি। পরস্পরে নানারকম কথা কইছে ছড়ার সুরে।

একজন বলছে—"কোথায় ছিলে, ও বহিন্‌?"

দ্বিতীয় উত্তর দিচ্ছে—"বনবাদাড় যেথায় গহীন।"

তৃতীয় প্রশ্ন করছে—"তুমি ছিলে কোথায় বোন ?"

প্রথমা— "শুনবি যদি, তবে শোন্—
জাহাজ বেয়ে গেল নেয়ে
আলেপ্পো সে অনেক দূরে :
কোঁচড়ভরা বাদাম চিবোয়
বৌটা তার বেড়ায় ঘুরে ;
'আমায় একটা দে-লো'—
যেই বলেছি তেড়ে এলো—
আমায় দিল তাড়িয়ে,
ছুঁয়ে বলছি দাঁড়িয়ে,
ওর সোয়ামীর করব কী যে হাল—
ঐ জাহাজে চড়ব গিয়ে আমি।
তবে আমার নামই।"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া—"মোরা নাবিকটারে ধরব—
শুষে রক্ত নেব।
জাহাজখানাই থাকবে নাকি ভালো ?
তুলব তুফান, ঝড়ো মেঘ
উড়বে কালো কালো—"

হঠাৎ দূরে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল।

তিনটি ডাইনীই ব্যস্ত হয়ে একসুরে গাইল—
"বাজে ঐ দামামা,
ম্যাক্‌বেথটা এল রে, থামা বাজনা থামা !"

সত্যিই যুদ্ধ শেষ করে ম্যাক্‌বেথ আর ব্যাংকো সেই পথে রাজধানীতে ফিরছেন সেই সময়ে। তেজী ঘোড়ার পিঠে পাশাপাশি চলতে চলতে যুদ্ধেরই কথা আলোচনা করছেন তাঁরা, এমন সময়ে ব্যাংকো ভয়ানক চমকে উঠলেন। সমুখেই তিনি ডাইনীদের দেখতে পেয়েছেন।

চমকে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কে তোমরা? তোমরা কি জীবিত প্রাণী? হাড়ের উপর চামড়া-ঢাকা শুকনো চেহারা দেখলে পৃথিবীর জীব বলে তো তোমাদের মনে হয় না। তা যদি না হও, তোমরা কি আমার কথার উত্তর দেবে? আমি কি বলছি—তা বুঝেছ বোধ হয়। তা নইলে ঠোঁটে আঙুল তুলে আমায় চুপ করতে ইশারা করবে কেন?"

ম্যাক্‌বেথও প্রশ্ন করলেন—"কথা কইতে পার তো উত্তর দাও। তোমরা কারা? তোমরা কী?"

এইবার প্রথমা ডাইনী কথা কইল—"জয় হোক ম্যাক্‌বেথ! গ্লামিসের থেন, তোমার জয় হোক!"

তার সুরে সুর মিলিয়ে দ্বিতীয়া ডাইনীও চেঁচিয়ে উঠল—"জয় ম্যাক্‌বেথ! কডোরের থেন! তোমারই জয়!"

তৃতীয়া উঠে গেল একেবারে চরমে—"জয় ম্যাক্‌বেথ! তুমি হবে স্কটল্যাণ্ডের রাজা!"

ম্যাক্‌বেথ ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলেন। এ-রকম একটা ঘটনা ঘটলে কেউ কি স্থির থাকতে পারে কখনও? একবার তিনি বিস্ময়ে অবাক্ হন, তারপরই উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকেন। নানা রকমের চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করছে। একটাকে দাবিয়ে আর একটা মাথা তুলবার চেষ্টা করছে। তিনি খুশী হবেন, না রাগ করবেন—তা বুঝে উঠতে পারছেন না। এরা বলে কী? কডোর-এর থেন? স্কটল্যাণ্ডের রাজা?—এসব তিনি ত কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেননি!

ব্যাংকোই কথা কইলেন আবার, "সত্য করে বল—তোমরা কি দেহধারী প্রাণী, না হাওয়া মাত্র? আমার বন্ধুকে তোমরা অনেক ভাল ভাল কথা বলেছ, ভবিষ্যতে তিনি মস্ত-বড় লোক হবেন বলে আশা দিয়েছ। কিন্তু আমায় তোমরা একটি কথাও বলনি। বলবার কি কিছুই নেই আমাকে? আমি অবশ্য তোমাদের

দয়ার ভিখারী নই। কিংবা তোমাদের ভয়ে ভীতও নই। তবু আমি অনুরোধ করি—যদি আমার সম্বন্ধে তোমাদের কিছু জানা থাকে তবে তা জানাতে পার।"

তখন প্রথমা ডাইনী বলল—"জয় হোক ব্যাংকো! তুমি ম্যাক্‌বেথের মত বড় হবে না, আবার একদিক দিয়ে ম্যাক্‌বেথের চাইতেও বড় হবে।"

দ্বিতীয়া বলে উঠল—"জয় হোক ব্যাংকো! ম্যাক্‌বেথের মত সুখ তোমার ভাগ্যে নেই। তবু, আর একদিক দিয়ে ম্যাক্‌বেথের চাইতে অনেক বেশী সুখী হবে তুমি।"

প্রথম দুজনের কথাই বুঝি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল তৃতীয়া —"তুমি নিজে রাজা হবে না, কিন্তু তোমার বংশে যারা জন্মাবে, তারা হবে এদেশের রাজা!"

ততক্ষণে ম্যাক্‌বেথের মাথা কতকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। তিনি জানতে চাইলেন—"তোমাদের কথার মানে কি? গ্লামিসের থেন আমি বটে, কিন্তু কডোর? কডোর-এর থেন এখনো জীবিত! আর রাজা? আমি রাজা হব—এ তো ধারণাতেও আসে না! এসব আজগুবি খবর তোমরা পাও কোথায়? আর এসব শোনাবার জন্য এই অলক্ষুণে জলার ভিতর তোমরা আমাদের পথই বা আটকেছ কেন? বল, বলতেই হবে।"

ম্যাক্‌বেথের অনুরোধ বা শাসানি—কোনটাতেই ফল হল না, ডাইনীরা তিনজনই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেন।

যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল, সেইদিকে অবাক্ হয়ে ম্যাক্‌বেথ তাকিয়ে আছেন দেখে ব্যাংকো বললেন—"মিলিয়ে গেল! জলের বুদ্বুদ যেমন জলে মিলিয়ে যায়, এরা তেমনি মাটিতে মিলিয়ে গেল।"

ম্যাক্‌বেথ তাঁর ভুল শুধরে দিলেন—"মাটিতে নয়, বাতাসে! আর একটু থেকে গেলে ভাল হত।"

ব্যাংকো কপালে হাত বুলিয়ে নিজের মনে বললেন—"সত্যিই কি ওদের দেখেছি আমরা? না ও শুধু আমাদের চোখের ভুল? এক রকম শিকড় আছে, যা খেলে লোক পাগল হয়ে যা-তা দেখতে পায় চোখের সামনে। আমরা তো সেই শিকড় খাইনি?"

ব্যাংকোর কথা কানেই প্রবেশ করল না ম্যাক্‌বেথের। তিনি কী-যেন ভাবছিলেন। সেই ভাবনারই জের টেনে আপন মনে বললেন —"ব্যাংকো, তোমার ছেলেরা রাজা হবে।"

কী-যে ভাবছেন ম্যাক্‌বেথ, তা বুঝতে পারা ব্যাংকোর মত বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে শক্ত নয়। তবু বন্ধুর কথার জবাব দেওয়ার সময় সেদিক দিয়েও গেলেন না তিনি; পরিহাসের সুরে জবাব দিলেন— "কিন্তু তুমি যে নিজেই হবে রাজা!"

হঠাৎ অদূরে কয়েকজন ঘোড়-সওয়ারকে দেখতে পাওয়া গেল। তারা রাজসভারই লোক। তারা আসছে রাজধানী থেকে। রাজা ডানক্যান তাদের পাঠিয়েছেন—রণজয়ী সেনাপতি দুজনকে আগু বাড়িয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

তারা জানালো—রাজা আদেশ দিয়েছেন যে কডোরের থেনের মাথা কেটে ফেলা হবে, আর তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত করে তা দিয়ে দেওয়া হবে ম্যাক্‌বেথকে।

ম্যাক্‌বেথের মুখে আর কথা নাই। ঐ ডাইনীরা তাহলে সত্য কথাই তো বলে গিয়েছে! যেসব ভবিষ্যতের কথা তারা বলে গেল, তার কতকটা তো সত্য বলে প্রমাণিত হয়ে গেল। বাকী অংশটাও কি তাহলে সত্য হবে? তিনি কি সত্যই স্কটল্যাণ্ডের রাজা হবেন?

ব্যাংকো তাঁর মনের কথা বুঝলেন! এ-রকম ভাবে চিন্তা করতে শুরু করলে মানুষের মনে আস্তে আস্তে পাপ এসে ঢোকে, লোভের বশে মানুষ একটু একটু করে পাপের পথে পা বাড়ায়। তিনি ম্যাক্‌বেথের কানে কানে বললেন—"সাবধান, বন্ধু সাবধান! ওরা নরকের দূতী, ওদের ফাঁদে পা দিও না। লোভকে ঠাঁই দিও না

মনে। ভগবান নিজে থেকে যা দেবেন তাতেই খুশী থাক। আগু বাড়িয়ে কোন কিছুকে ঘটিয়ে তুলতে যেও না, ওতে অনর্থ ঘটতে পারে।"

* * *

ম্যাক্‌বেথ গ্লামিসের থেন, কাজেই তাঁর নিজের একটা দুর্গ আছে। সেখানে বাস করেন তাঁর স্ত্রী—লেডী ম্যাক্‌বেথ।

ম্যাক্‌বেথ রাজধানী থেকে পত্র দিয়েছেন স্ত্রীকে। জলার ভিতর ডাইনীরা তাঁকে কী কথা বলেছে—খোলাখুলি বর্ণনা দিয়েছেন তার।

পত্র পড়েই লেডী ম্যাক্‌বেথ দারুণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। ম্যাক্‌বেথের এই স্ত্রীটির উচ্চাশার সীমা নেই। স্বামীর বাহুবল এবং নিজের মনোবলের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। চেষ্টা করলে স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনলাভ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয় বলেই তিনি মনে করেন। আর অসম্ভব যে নয় তার প্রমাণ তো ডাইনীদের ঐ কথা! ভাগ্যের মন্দিরের দরজা খুলে গিয়েছে তাঁদের সমুখে, সোজা এগিয়ে গেলেই রাজসিংহাসন। সাহস করে বসলেই হল।

লেডী ম্যাক্‌বেথ পত্র পড়েই মনকে শক্ত করে ফেললেন। যেমন করে হোক—ডাইনীদের আশ্বাস সফল করতেই হবে। সিংহাসন তাঁকে পেতেই হবে। স্বামী তাঁর বাহুবলে অন্য সকলের উপরে; কিন্তু মন তাঁর দুর্বল। তাঁকে উত্তেজিত করে তুলতে হবে, সিংহাসনে বসবার জন্য যাতে তিনি লক্ষ্য স্থির রেখে দৃঢ়পদে এগিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য তাঁকে সাহস আর উৎসাহ যোগাতে হবে লেডী ম্যাক্‌বেথকেই।

তা তিনি পারবেন। দোমনা ভাব নেই লেডী ম্যাক্‌বেথের অন্তরে। কোমলতার ঠাঁই নেই সেখানে। বজ্রের মত কঠোর সে-হৃদয়!

কী চমৎকার যোগাযোগ! দূত এসে জানাল—রাজা ডানক্যান এই দুর্গে আজ রাত্রে অতিথি হয়ে আসছেন। ম্যাক্‌বেথের উপর

তাঁর স্নেহ যে অতি গভীর, তারই প্রমাণ দেবার জন্য। বড় বেশী ভাল না বাসলে দেশের রাজা কি যেচে কারও বাড়িতে রাত্রিবাস করতে যান?

লেডী ম্যাক্‌বেথের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। এ কি নিয়তির ইশারা?

নিজেকে কোনমতে সংযত করে দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার প্রভু কোথায়? সেনাপতি ম্যাক্‌বেথ?..."

"তিনিও এলেন বলে"—দূত বিদায় নিল।

লেডী ম্যাক্‌বেথের ললাটে ফুটে উঠল ভ্রূকুটি, পাপচিন্তা মনে ঢুকলে মুখে তার ছাপ পড়বেই।

স্বামী আসতেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—"রাজা আসছেন কখন?"

"আজ সন্ধ্যায়!" উত্তর করলেন ম্যাক্‌বেথ।

"ফিরতে চান কবে?"

"রাত্রি শেষেই!"

"এ-রাত্রি তাঁর শেষ হবে না তাহলে"—লেডী ম্যাক্‌বেথের উত্তর এল যেন ধারালো তরোয়ালের ফলার মত।

"এ কী? এ কী বলছ তুমি?"—নিজের মনে যে চিন্তা এক একবার বিদ্যুতের মত আচমকা হানা দিয়ে যাচ্ছে—পত্নীর মুখে সেই কথাই খোলাখুলি উচ্চারিত হতে শুনে ভয়ে এক পা পিছিয়ে এলেন ম্যাক্‌বেথ।

* * *

রাজা এলেন। সঙ্গে এলেন স্কটদেশের সমস্ত বড় বড় থেন, প্রত্যেকটি উচ্চপদের কর্মচারী, ব্যাংকো, ম্যাক্‌ডাফ, রাজপুত্র ম্যালকম ও ডোনালবেন। সবাই আজ ম্যাক্‌বেথের অতিথি। সবাই সম্মান জানাতে এসেছেন সেই বীর সেনাপতিকে—যাঁর তরবারি নরওয়ের রাজাকে সাগরের ওপারে তাড়িয়েছে, আর কডোরের বিদ্রোহী

থেনের মাথা কেটে ফেলে দেশে ফিরিয়ে এনেছে শান্তি আর সুশাসন।

মহাভোজের আয়োজন করেছেন ম্যাক্‌বেথ। মাননীয় অতিথিরা খেতে বসেছেন।

কিন্তু নিজে ম্যাক্‌বেথ ভোজসভায় বসতে পারছেন না ঠাণ্ডা হয়ে।

লেডী ম্যাক্‌বেথ তাঁর কানে যে মন্ত্র দিয়েছেন—তা যেন বিষের মত জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর অন্তরে। একটা দারুণ তোলপাড় চলেছে তাঁর মনে। দুটো শক্তি দুদিকে টানছে তাঁর মনকে। উচ্চাশা বলছে—"এ সুযোগ হারিও না। রাজমুকুট আজ তোমার হাতের মুঠোয়। ডাইনীরা তো বলেই গিয়েছে—ও রাজমুকুট তোমার হবে। সাহস করে হাত বাড়াও। বুড়ো রাজার মাথা থেকে মুকুট তুলে নিয়ে নিজের মাথায় পর।"

কিন্তু মনুষ্যত্ব তখনো মরে যায়নি একেবারে। বিবেক এক একবার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। "ধিক! তোমার রাজা, তোমার অতিথি, ভালবেসে যেচে তিনি তোমার ঘরে এসেছেন! ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধ! কত স্নেহ করেন তোমাকে! তাঁকে তুমি হত্যা করবে? এত পাপ কখনো মানুষের সয়? এ কাজ কোরো না ম্যাক্‌বেথ!"

অন্তরের এ দোটানা বুঝি পাগল করে দেবে ম্যাক্‌বেথকে। তিনি পালিয়ে আসেন ভোজসভা থেকে। পিছনে আসেন লেডী ম্যাক্‌বেথ।

লেডী ম্যাক্‌বেথের মনে দোটানা নেই। উচ্চাশা ছাড়া আর কিছু নেই তাঁর চিন্তায়। তিনি মন স্থির করে বসে আছেন। সিংহাসন তাঁর চাই। আজ রাত্রেই পথের কাঁটা সরাতে হবে।

স্বামীর দুর্বলতা ধরা পড়ে যায় তাঁর চোখে। তিনি কঠোর তিরস্কার করে বলেন—"কেমন ধারা পুরুষ তুমি—অন্তরে যা চাও, তা পাওয়ার চেষ্টা করতে ভয় পাও?"

"ভয় নয়!"—ম্যাক্‌বেথ ক্ষীণ স্বরে উত্তর করেন—"ভয় নয়। লোকে আমায় ভালবাসে, সম্মান করে। এ কাজ যদি আমি করি, আর তা যদি প্রকাশ হয়ে যায়, কী কলঙ্কের কথা বল দেখি!"

"কলঙ্ক?"—গর্জে উঠলেন লেডী ম্যাক্‌বেথ, "তুচ্ছ কলঙ্কের ভয়? কোন কিছুর ভয়ে, কোন কিছুর চিন্তায় আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি না। বেশী আর কী বলব তোমাকে। আমি নারী, সন্তান গর্ভে ধরেছি, বুকের দুধ দিয়ে লালন করেছি তাকে। কিন্তু যে কাজে হাত দিয়েছি, তাকে সফল করে তুলবার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, সেই সন্তানকে আমি নিজের হাতে পাথরে আছড়ে হত্যা করতে পারি। আর তুমি—পুরুষ তুমি, বীর তুমি, নিয়তিকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ অধিকারী তুমি, তুমি কর কলঙ্কের ভয়? বেশ, তোমায় কিছু করতে হবে না। আমি নিজের হাতেই এ কাজ করব।"

* * *

গভীর রাত্রি। রাজকর্মচারী রাজপারিষদ সবাই ঘুমে অচেতন। কেউ দুর্গের ভিতরে, কেউ দুর্গের বাইরে অন্য ভবনে।

সবাই ঘুমে অচেতন। এমন কি রাজার শোবার ঘরের দরজায় যে দুইজন প্রহরী আছে তারা পর্যন্ত। তাদের জেগে থাকারই কথা, জেগে পাহারা দেওয়াই তাদের কাজ। কিন্তু লেডী ম্যাক্‌বেথ তাদের পানীয়ের ভিতর এমন কিছু ঔষধ মিশিয়ে দিয়েছেন, যা খেয়ে একেবারে অচেতন হয়ে পড়েছে ওরা।

ম্যাক্‌বেথকে পাশের ঘরে রেখে লেডী ম্যাক্‌বেথই ঢুকলেন রাজার ঘরে। ছুরিকা তাঁর হাতে, খুনের নেশা তাঁর চোখে।

ঘরে ঢুকলেন বটে লেডী ম্যাক্‌বেথ, কিন্তু তখনই বেরিয়ে এলেন কাঁপতে কাঁপতে। স্বামীকে বললেন—"হল না। আমি পারলাম না। ছুরি তুলেছিলাম তাঁর গলায় বসিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু হঠাৎ

কেমন যেন মনে হল—রাজার মুখটা যেন আমার স্বর্গীয় বাবার মুখের মত। আমার হাত কেঁপে গেল, বুকও কেঁপে উঠল। ছুরি আর হাতে তুলতে পারলাম না।"

ম্যাক্‌বেথ এগিয়ে গেলেন। মন থেকে তিনি ঝেড়ে ফেলেছেন দ্বিধা আর ভয়। যোদ্ধা মানুষ, রক্ত নিয়েই তাঁর খেলা। সেই রক্ত তিনি চোখে দেখছেন এখন। সমুখে দেখছেন—একখানা ছোরা হাওয়ায় দুলছে। ঠিক তাঁর হাতের নাগালের ভিতর। সেই ছোরাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। সরসর করে এগিয়ে যায় ভৌতিক হাতিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে পড়েন ম্যাক্‌বেথও।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে এলেন!

কাজ তিনি সমাধা করে এসেছেন।

তাঁর হাতের ছুরিতে রক্ত। তাঁর চোখে পাগলের চাউনি।

"একটা চীৎকার শুনছি না? একটা চীৎকার?"—এসেই ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন পত্নীকে।

লেডী ম্যাক্‌বেথ অবাক—"চীৎকার! না তো! তবে একটা প্যাঁচা ডাকছিল বটে!"

"কিন্তু আমি স্পষ্ট চীৎকার শুনেছি! কে যেন ককিয়ে উঠল—'আর ঘুমিয়ো না জাগো! গ্লামিস ঘুমকে হত্যা করেছে। সে আর ঘুমাবে না, কডোর আর ঘুমাবে না, ঘুমাবে না ম্যাক্‌বেথ!"

"তোমার মনের ভুল।" লেডী ম্যাক্‌বেথ বললেন,—"তোমার মনের ভুল। তোমার পদে পদে ভুল হচ্ছে, ঐ মনের ভুলের জন্য। রক্তমাখা ছুরিখানা হাতে ক'রে নিয়ে এসেছ কেন? ওটা তো প্রহরীদের হাতে গুঁজে রেখে আসার কথা ছিল। যাও, রেখে এসো!"

কিন্তু অসমসাহসী ম্যাক্‌বেথের সে সাহস আর নেই। আবার সেই বিভীষিকার ভিতর যাওয়া? না, না।—ম্যাক্‌বেথ আর সে

কক্ষে যেতে রাজী হলেন না। লেডী ম্যাক্‌বেথই গিয়ে ছোরা রেখে এলেন নিদ্রিত প্রহরীর হাতে।

*　　*　　*

রাত্রি শেষে ম্যাক্‌ডাফ এসে দুর্গের দ্বারে করাঘাত করতে লাগলেন। রাজার নিজের কাজগুলি তিনিই করেন। রাজার আদেশ ছিল—সূর্য উঠবার আগেই ম্যাক্‌ডাফ এসে রাজাকে জাগাবেন।

তোরণে প্রহরী ছিল, সে দ্বার খুলে দিল।

ম্যাক্‌ডাফ সোজা উপরে উঠলেন। আর রাজার ঘরে প্রবেশ করেই হাহাকার করতে করতে তক্ষুনি বেরিয়ে এলেন।

তাঁর সেই হাহাকারে জেগে উঠল দুর্গবাসীরা সবাই। কেউ একজন রাত্রিবেলা—রাজাকে হত্যা করে গিয়েছে শুনে ঘৃণায় আর ভয়ে সবাই যেন পাথর হয়ে গেল একেবারে।

ম্যাক্‌বেথ যেন ঘুম থেকেই জেগে ছুটে এলেন। রাজার ঘরে রক্তের স্রোত দেখে চীৎকার করে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগলেন—তাঁর বাড়িতেই খুন হলেন রাজা? এমন দয়ালু প্রভু, ম্যাক্‌বেথের গৃহে অতিথি হতে এসেই প্রাণ হারালেন? এর চেয়ে মন্দভাগ্য ম্যাক্‌বেথের কী হতে পারে?

সকলের আগেই প্রশ্ন উঠল হত্যা করল কে?

প্রহরী দুটো তখনও অচেতন হয়ে পড়ে আছে, তাদের পাশে পড়ে আছে রক্তমাখা ছোরা।

ম্যাক্‌বেথ বললেন—"নিশ্চয়ই এরাই হত্যা করেছে।"

তিনি যেন ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন একেবারে। তখনই তরোয়াল খুলে মাথা কেটে ফেললেন প্রহরী দুটোর।

পাছে চৈতন্য ফিরে আসবার পরে তারা ম্যাক্‌বেথের বিরুদ্ধে কিছু বলে বসে—তার পথ আগে থাকতেই বন্ধ করলেন ম্যাক্‌বেথ।

থেন ও রাজকর্মচারীরা রাজার মৃতদেহের সমুখে দাঁড়িয়ে শোক করছেন—ওদিকে ম্যালকম আর ডোনালবেন তেজী ঘোড়ায় চড়ে

দেশ ছেড়ে পালালেন। সাধারণ বুদ্ধির তাঁদের অভাব নেই; তাঁদের ভয় হল—যে সব শত্রু রাজাকে হত্যা করেছে, রাজ্যলোভের বশেই এ পাপ করেছে সন্দেহ নেই—তারা রাজপুত্রদেরও রেহাই দেবে না। কে শত্রু কে মিত্র—বুঝতে পারবার আগেই হয়ত তাঁরা মারা পড়বেন।

তাঁরা পালালেন—দক্ষিণ দিকে। ইংলণ্ডের রাজার আশ্রয় নেওয়াই তাঁদের মতলব।

এদিকে তাঁরা পালাতেই ম্যাক্‌বেথ সুযোগ পেয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"নিজেরা দোষী না হলে রাজপুত্রেরা পালালেন কেন? নিশ্চয়ই রাজ্যলোভে ওঁরাই পিতৃহত্যা করেছেন।"

রাজ্যে অরাজক থাকতে পারে না। রাজবংশীয় বলতে ম্যাক্‌বেথই এখন আছেন, সিংহাসনে তিনিই বসলেন। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য হল ডাইনীদের।

* * *

ম্যাক্‌বেথ রাজা হলেন, কিন্তু মনে তাঁর শান্তি কই?

কেবলই মনে পড়ে রাজপদ তাঁর বংশে স্থায়ী হবে না। ডাইনীদের কথায় তো আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই! তারা বলেছে ব্যাংকোর সন্তানেরাই রাজা হবে ম্যাক্‌বেথের পরে।

ম্যাক্‌বেথের ক্ষেত্রে যখন ডাইনীদের বাণী সত্য হয়েছে, ব্যাংকোর ক্ষেত্রেও হবে সন্দেহ নেই।

ম্যাক্‌বেথ চিন্তা করতে লাগলেন।

ব্যাংকো আর তাঁর পুত্র ফ্লিয়ান্সকে যদি হত্যা করা যায়, তবে তো বংশই রইল না ব্যাংকোর! রাজপদ তা হলে ব্যাংকোর বংশে কি করে যাবে? এই পথ! এছাড়া আর পথ নেই।

এক রাত্রে ম্যাক্‌বেথ একটা বৃহৎ ভোজের আয়োজন করলেন। সিংহাসন পেয়েছেন তিনি, সেই উপলক্ষ করে এ ভোজ! রাজ্যের

সমস্ত ধনী-মানী লোকের নিমন্ত্রণ হল। ব্যাংকো ও তাঁর পুত্রের তো বটেই!

এদিকে ম্যাক্‌বেথ দুজন হত্যাকারী নিযুক্ত করলেন। তারা পথে ওত পেতে রইল রাত্রিবেলা। ব্যাংকো আর ফ্লিয়ান্স যখন একটা বাগানের কাছ দিয়ে ভোজসভার দিকে আসছেন, তারা ছোরা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওঁদের উপর। ফ্লিয়ান্স পালাল বটে, কিন্তু ব্যাংকো নিহত হলেন।

ওদিকে ম্যাক্‌বেথের প্রাসাদে ভোজ আরম্ভ হল। আলোকে ঝলমল, নাচে গানে মুখর, সে ভোজনকক্ষ। দুর্লভ রাজভোগ টেবিলে টেবিলে থরে থরে সাজানো। টেবিল ঘিরে বসেছেন—দেশের শ্রেষ্ঠ লোকেরা, বীর ও সম্মানী যত পুরুষ, আর সেরা সুন্দরী সালংকারা যত রমণী।

ম্যাক্‌বেথ জনে জনে সবাইয়ের সঙ্গে মিষ্টালাপ করে বেড়াচ্ছেন। ব্যাংকো আসেননি দেখে দুঃখ করছেন—"আজ ব্যাংকো অনুপস্থিত না থাকলে বলতে পারতাম যে আমার গৃহে দেশের রত্নেরা সব একত্র হয়েছেন।"

রাজার জন্য ঠিক মাঝখানে সবচেয়ে উঁচু আসন নির্দিষ্ট রয়েছে। অতিথিদের ভিতর দিয়ে ম্যাক্‌বেথ সেই আসনের দিকে অগ্রসর হলেন। হঠাৎ তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল। তাঁর সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং ব্যাংকো! রক্ত তাঁর সারা দেহে!

ব্যাংকো না মরে গিয়েছেন?

এ তবে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা?

অতিথিরা কেউ সে প্রেতাত্মাকে দেখতে পাচ্ছেন না! এমন কি লেডী ম্যাক্‌বেথও না! দেখছেন একমাত্র ম্যাক্‌বেথ।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মাথা গোলমাল হয়ে গেল ম্যাক্‌বেথের। তিনি পাগলের মত চীৎকার করতে লাগলেন—"কেন এসেছ? তুমি বলতে পার না যে এ-কাজ আমি করেছি। তা ছাড়া কবর থেকে

একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হ'ল ম্যাক্‌বেথের সম্মুখে,—লোহার শিরস্ত্রাণ-পরা একটা মাথা।

মৃতেরা যদি ফিরে আসতে থাকে, তবে তো বিপদ! যাও যাও চলে যাও! অন্য যে-কোন ভয়ানক মূর্তি ধরে তুমি আস—বাঘ, গণ্ডার, ভল্লুক—আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু ঐ যে ছায়ামূর্তি—যার হাড়ের ভিতর মজ্জা নেই, যার রক্তে নেই উষ্ণতা, যার চোখে নেই দৃষ্টি—ও মূর্তি আমার অসহ্য। যাও—যাও—"

হঠাৎ ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হল।

অতিথিরা ম্যাক্‌বেথের এ প্রলাপ শুনে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক্। কাকে এসব বলছেন ম্যাক্‌বেথ? কেউ ত কিছু দেখতে পাচ্ছে না!

একটা অজানা সন্দেহ উঁকি দেয় সবাইয়ের মনে। কার ছায়া-মূর্তির কথা বলছেন ম্যাক্‌বেথ? কে ভয় দেখাতে চাইছে ভয়ানক মূর্তিতে এসে? কিন্তু ও-সন্দেহ নিয়ে বেশী ভাববার সময় তাঁরা পেলেন না। ম্যাক্‌বেথই পাগল হয়েছেন, তাঁর স্ত্রী ত হন নি। তিনি স্বামীর দোষ-ত্রুটি ঢেকে নেবার জন্য দ্রুত এগিয়ে এলেন, অতিথিদের সম্বোধন করে বললেন—"আপনারা কিছু ভাববেন না। এরকম মাথা গরম আমার স্বামীর মাঝে মাঝেই হয়। ছেলেবেলাতেই এটা শুরু হয়েছিল। রাজার শোচনীয় মৃত্যুর পর থেকে ব্যাধিটা বেড়ে গিয়েছে। আপনারা ঠাণ্ডা হয়ে বসুন একটু, উনি এখনই সামলে উঠবেন।"

অতিথিদের এই কথা বলে স্বামীকে কানে কানে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন লেডী ম্যাক্‌বেথ—"স্থির হও! তোমার আচরণে সবাইয়ের মনে সন্দেহ হবে যে! ভূত অন্য কেউ দেখতে পাচ্ছে না, একমাত্র তুমিই দেখছ! রাজাকে সরিয়ে দেবার রাত্রে যেমন তুমি হাওয়ায় ছুরি দেখেছিলে। শান্ত হও, ঠাণ্ডা হও, নিজের আসনে বসে ভোজে যোগদান কর। নইলে সব যে পণ্ড হয়ে যায়!"

পত্নীর ভর্ৎসনা শুনে অনেক চেষ্টায় নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে একপাত্র পানীয় হাতে তুলে নিলেন ম্যাক্‌বেথ। সবাইয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকুক—এই কামনা করে সেই পাত্র যেই মুখে তুলতে

যাবেন এমন সময় আবার তাঁর সম্মুখে দেখা দিল সেই প্রেতাত্মা! ম্যাক্‌বেথ আবার সব ভুলে গিয়ে চীৎকার শুরু করলেন। এর পর অতিথিরা আর বসতে রাজী হলেন না। ভোজসভা ভেঙে গেল। যে-যার খুশীমত এটা-ওটা সন্দেহ প্রকাশ করতে করতে গৃহে ফিরে গেলেন।

পরের দিনই ম্যাক্‌বেথ গেলেন সেই পাহাড়-ঘেরা জলায়। যেখানে প্রথম তিনি দেখা পেয়েছিলেন ডাইনীদের। এখন তিনি নিজেকে ঠাণ্ডা করে এনেছেন। শক্ত করে তুলেছেন। ব্যাংকোর সম্বন্ধে ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সত্য হবে তাই এবার জানতে চান তিনি।

ব্যাংকো মরেছে, কিন্তু বেঁচে আছে ফ্লিয়ান্স। সে কি রাজা হবেই? তাকে সরানোর জন্য ম্যাক্‌বেথের চেষ্টা কি সফল হবেই না? জানতে হবে এসব কথা।

ডাইনীরা প্রস্তুত হয়েই ছিল। নরকের আগুন জ্বেলে এক বিশাল কড়াই চাপিয়ে দিয়েছিল তার ওপরে। তাতে সিদ্ধ করছিল —সাপ, ব্যাং, প্যাঁচা আর শেয়ালের নাড়িভুঁড়ি, ড্রাগনের আঁশ, নেকড়ের দাঁত, ডাইনীর শুকনো মজ্জা, হাঙরের চোয়াল এবং বিষাক্ত হেম্‌লকের শিকড়।

ম্যাক্‌বেথ এসে প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, নিজের সম্বন্ধে—'আমার কথা আর কি জান, বল।"

কথার উত্তর না দিয়ে ডাইনীরা কড়া উলটে দিল আগুনের ভিতর!

অমনি নীল আকাশে বাজ ডাকল কড় কড় রবে, আর একটা ছায়ামূর্তি দেখা দিল ম্যাক্‌বেথের সম্মুখে, লোহার টুপি-পরা একটা মাথা মাত্র।

সে এসেই ডেকে উঠল—"ম্যাক্‌বেথ! ম্যাক্‌বেথ, ম্যাক্‌ডাফ থেকে সাবধান থাকবে, ম্যাক্‌বেথ।"

হু! ম্যাক্‌ডাফ! ম্যাক্‌বেথ মনে মনে সায় দিলেন—ভূতের কথা ঠিক বোধ হয়। ম্যাক্‌ডাফটা হয়ত বেগ দেবে।

হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ছায়ামূর্তি।

আবার কড় কড় বাজ পড়ার শব্দ! এবার এল দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি —রক্তমাখা একটা শিশু।

সে ডাকল—"ম্যাক্‌বেথ! রক্তপাত করতে ভয় কোরো না! ম্যাক্‌বেথ! সাহসী হও, যা দরকার, তা যেমন করেই হোক করে ফেলা চাই। ম্যাকবেথ! ভয় নেই, নারীগর্ভের সন্তান কেউ তোমার কোন্ ক্ষতি করতে পারবে না!"

ম্যাক্‌বেথ আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠলেন। তবে আর ম্যাক্‌ডাফকে ভয় কী? নারীগর্ভের সন্তান আর নয় কে? ম্যাক্‌ডাফও ত মায়ের পেট থেকেই পড়েছে—না কী?

বজ্রনাদের সঙ্গে তৃতীয় মূর্তি এল—মুকুটপরা এক বালক, হাতে তার একটা বিরাট বৃক্ষ।

সে এসে বলল—"বার্নাম বন যতদিন না ডানসিনান পাহাড়ে উঠে আসছে, ততদিন ম্যাক্‌বেথের ভয় নাই।"

ম্যাক্‌বেথের আনন্দ দেখে কে? একটা বন কি করে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসবে? গাছের কি পা আছে?

এ পর্যন্ত সব ভালই শোনা গেল। তারপর ম্যাক্‌বেথ জানতে চাইলেন ব্যাংকোর বংশ রাজপদ লাভ করবে কিনা।

তখন একে একে আটটি রাজমূর্তি হেঁটে চলে গেল ম্যাক্‌বেথের সমুখ দিয়ে। শেষ রাজার হাতে একখানা আয়না। তার ভিতর যেন আরও অনেক আবছা মূর্তি দেখা যায়।

সেই আট রাজার পশ্চাতে যাকে দেখা গেল—সে ব্যাংকোর প্রেতাত্মা। ম্যাক্‌বেথের মনে হল—সেই প্রেতাত্মার মুখে একটা উপহাসের হাসি। ব্যাংকো যেন হেসে হেসে বলছেন—"ম্যাকবেথ,

এই দেখ, আমার বংশের এরাই হবে দেশের রাজা। কোন উপায়েই তুমি এদের রুখতে পারবে না, পারবে না।"

* * *

লেডী ম্যাক্‌বেথ!

পাপের ফল ফলতে শুরু হয়েছে। তাঁর হয়েছে মাথা খারাপ। একেবারে পাগল! সারা দিন জল দিয়ে হাত ধোন। জল না দিয়েও হাত ঘষেন। বিড়বিড় করে বলেন—"এ রক্তের দাগ কিছুতেই মুছবার নয়। আরব দেশের সমস্ত সুগন্ধি আতরেও রক্তের গন্ধ যাবে না এ-হাত থেকে!"

রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতেই ঘুরে বেড়ান।

চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে বলছেন—"এ-ব্যাধি মনের ব্যাধি, দেহের নয়। আমরা কী চিকিৎসা করব এর? এ-রোগের ওষুধ নেই।"

ম্যাক্‌বেথ রেগে উঠলেন—"মনের ব্যাধির ওষুধ নেই? তাহলে দূরে ফেলে দাও তোমাদের ওষুধের বাক্স!"

স্ত্রীর অসুখের চিন্তা নিয়ে তিনি বসে নেই। তিনি ম্যাক্‌ডাফকে ধরে আনবার জন্য সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু চতুর ম্যাক্‌ডাফ অবস্থা বুঝে আগেই ইংলণ্ডে পালিয়েছিলেন। সৈন্যরা তাঁকে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের হত্যা করে ফিরে এল।

সারা দেশটা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। সবাই কানাকানি করতে লাগল যে রাজা ডানক্যানকে এবং সেনাপতি ব্যাংকোকে ম্যাক্‌বেথই হত্যা করেছেন। ম্যাক্‌ডাফের দেখাদেখি অনেক থেন পালিয়ে চলে গেলেন ইংলণ্ডে, যেখানে রাজা এডোয়ার্ডের আশ্রয়ে বাস করছেন যুবরাজ ম্যালকম।

ম্যালকমের একান্ত অনুরোধে স্কটল্যাণ্ডের অরাজকতা দূর করবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন এডোয়ার্ড, ইংলণ্ডের রাজা।

সেনাপতি সিওয়ার্ডের অধীনে একদল সৈন্য পাঠালেন ম্যাক্‌বেথকে দমন করবার জন্য।

সিওয়ার্ড স্কটল্যাণ্ডে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে ম্যালকম, ম্যাক্‌ডাফ, আরও অনেক স্কচ থেন ও যোদ্ধা।

ম্যাক্‌বেথ হাসলেন। কোন্ শত্রু তাঁর কি করতে পারে? ডাইনীরা বলেছে—বার্নাম কানন ডানসিনান পাহাড়ের মাথায় যতক্ষণ উঠে না আসছে—

হঠাৎ অন্তঃপুরে রোদনের রোল!

খবর এল লেডী ম্যাক্‌বেথ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ম্যাক্‌বেথ নিশ্বাস ফেলে বললেন—"মরবার আর সময় পেল না?"

দূর হোক সব চিন্তা! ম্যাক্‌বেথ ডানসিনান পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছেন। এই পাহাড়ই তাঁর নিরাপদ্ আশ্রয়! যতক্ষণ না বার্নাম বন—

দূত এসে খবর দিল—বার্নাম বন উঠে আসছে ডানসিনান পাহাড়ের মাথায়।

ক্রোধে গর্জে উঠলেন ম্যাক্‌বেথ। প্রতারণা। মিথ্যা! এ হতে পারে না। ধাপ্পা দিচ্ছে তাঁর নিজের ভৃত্যেরাই! একটা গোটা বন কখনো—?

কিন্তু বেরিয়ে আসতেই সত্যিই নিজের চোখে তিনি দেখলেন—বার্নাম বনটা ধীরে ধীরে উঠে আসছে পাহাড়ের উপর। আসলে ব্যাপার আর কিছু নয়—ইংরেজ সৈন্যরা শত্রুর তীর থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য বার্নাম বনের এক একটা গাছের ডাল কেটে তাই সমুখে ধরে পাহাড়ের মাথায় উঠে আসছে। দূর থেকে সৈন্যদের চোখে দেখা যায় না। ডালের আড়ালে মনে হয় বনটাই ক্রমশঃ উপরে উঠে আসছে বুঝি।

ডাইনীরা ফাঁকি দিয়েছে তাহলে ম্যাক্‌বেথকে! বার্নাম বন উঠে আসার অর্থ তাহলে এই? এইভাবে ওরা সরল মানুষকে ঠকায়?

পাপী হলেও ম্যাক্‌বেথ বীর। তিনি ভয় পেলেন না তবু! রণসাজে সেজে লাফিয়ে পড়লেন শত্রুর উপর। তাঁর অস্ত্রমুখে যে পড়ে, তার আর রক্ষা নাই।

তারপর এগিয়ে এলেন ম্যাক্‌ডাফ।

ম্যাক্‌বেথের ভয় হল। এর সম্বন্ধে সাবধান থাকতে বলেছে ডাইনীরা। কিন্তু তখনই আবার মনে পড়ে গেল মুকুটধারী প্রেতের আশ্বাস—"নারীগর্ভ থেকে যার জন্ম, এমন কেউ তোমার ক্ষতি করতে পারবে না!"

নির্ভয়ে তিনি ম্যাক্‌ডাফকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধ করলেন অসীম বীরত্বের সঙ্গে।

ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণী? ওতে যে বিশ্বাস করে, সে মূর্খ! ম্যাক্‌ডাফ ঠিক স্বাভাবিকভাবে নারীগর্ভ থেকে জন্মলাভ করেননি। অসময়ে চিকিৎসকের হস্ত তাঁকে মাতৃজঠর থেকে টেনে বার করেছিল। ডাইনীরা এদিক দিয়েও ফাঁকি দিয়েছে ম্যাক্‌বেথকে!

আজ স্ত্রী-পুত্র হত্যার শোধ নিতে এসেছেন ম্যাক্‌ডাফ। মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করছেন তিনি। আর ম্যাক্‌বেথ বীর হলেও আজ পাপে দুর্বল। ম্যাক্‌ডাফের মুখ থেকে তাঁর জন্মের রহস্য শুনবার পর থেকেই তাঁর ভয় হয়েছে, হাত তাঁর কাঁপছে তরোয়াল ঘোরাতে গিয়ে। ধর্মের জয় হল, ম্যাক্‌বেথ হলেন নিহত।

ম্যাক্‌বেথের মুণ্ড ম্যালকমকে উপহার দিয়ে ম্যাক্‌ডাফ তাঁকে স্কটল্যাণ্ডের রাজা বলে অভিবাদন করলেন।

———

রোমিও-জুলিয়েট

ইতালির মত সুন্দর দেশ পৃথিবীতে বেশী নেই। আর ভেরোনার মত সুন্দর শহরও ইতালিতে কম আছে। এই শহরে এক রাজা আছেন, আর আছেন অনেকগুলি অভিজাত পরিবার, অর্থ আর সম্মানের দিক্ দিয়ে যাঁরা প্রত্যেকেই রাজার প্রায় সমান। এঁদের ভিতর ধনে-মানে-সম্পদে সব সেরা যে দুটি বংশ, তাঁরা হচ্ছেন ক্যাপুলেট আর মণ্টেগু।

এই দুটি বংশের ভিতর শত্রুতা চলছে আজ বহু যুগ ধরে। কবে কত পুরুষ আগে যে এঁদের ভিতর কলহ বিবাদের সূচনা হয়, তা এখন আর কেউ জানে না। লোকে শুধু এইটুকু জানে যে যতদিনের ইতিহাস তাদের জানা আছে, ততদিন ধরে মণ্টেগু আর ক্যাপুলেটের ভিতর তারা সাপ-নেউলের মত রেষারেষি দেখে আসছে। পরস্পরের খুঁত খুঁজে বেড়ানো, সুযোগ পেলেই পরস্পরের ক্ষতির চেষ্টা করা, রাজপথে দেখা হলেই তরোয়াল খুলে একজন আর একজনের বুকে

চালিয়ে দেওয়া—এ সব ঐ দুটি বংশের যাবতীয় লোকের নিত্যকার কাজ, এমন কি ভৃত্যদেরও।

সেদিন এ-পক্ষের দুটি ভৃত্যের সাথে ও-পক্ষের দুটি ভৃত্যের পথে দেখা হয়ে গেল! যেই না দেখা হওয়া দুই একটা ঠাট্টা বিদ্রূপ, গালিমন্দের পরেই হাতিয়ার খুলে শুরু হল লড়াই। বেনভোলিও নামে মণ্টেগু বংশের এক যুবক ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল, সে এল ওদের থামিয়ে দেবার জন্য। এমন সময় ক্যাপুলেট গোষ্ঠীর টাইবল্টের আগমন হল সেখানে। সে আবার অতি বদরাগী যুবক, এসেই কোন কথায় কান না দিয়ে সে বেনভোলিওকে আক্রমণ করে বসল, শুরু হল একটা ঘোরতর অশান্তি।

শহরের লোকেরা এ রকম অশান্তি পছন্দ করে না। হাঙ্গামা হলে শহরের কাজকর্ম ঠিক মত চলে না। যারা কোন দলের নয়, তাদের মাথায়ও দৈবাৎ এক আধটা আঘাত লেগে যায়। তাই তারা লাঠিসোটা নিয়ে এল গোলমাল থামিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু ততক্ষণে আগুন ছড়িয়ে গেছে অনেকখানি। মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট—দুই দলেরই বহু লোক দুই দিক থেকে এসে পড়েছে। বিরাট একটা দাঙ্গা বেধে উঠল দেখতে দেখতে। মণ্টেগু লড়ছে ক্যাপুলেটের সঙ্গে, আর দুই দলেরই সঙ্গে লড়ছে সাধারণ নাগরিকেরা—একটা তুমুল ব্যাপার।

দুই পরিবারের মূল কর্তারা দুজনেই বৃদ্ধ। কিন্তু বুড়ো হলেও তাঁদের দাপট একটুও কমেনি। গোলমালের খবর পেয়ে তাঁরাও ছুটে এলেন কটিবন্ধ আঁটতে আঁটতে—"আমার তরোয়াল কই? নিয়ে এস আমার তরোয়াল—" এই রকম হাঁক তাঁদের মুখে। ভাবখানা এই যে অস্ত্র হাতে পেলে দুই বুড়ো এখনই পরস্পরকে জবাই করে ফেলবেন।

ওদিকে কিন্তু দাঙ্গার খবর পেয়ে রাজা এসে পড়লেন এই সময়ে। তিনি এর আগে বহুবার শাসন করে দিয়েছেন এই দুই ঝগড়াটে পরিবারকে। কিছুতেই এদের ঠাণ্ডা করতে না পেরে আজ তিনি

কঠোর হয়ে এসেছেন। কাউকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে তিনি তিক্ত স্বরে উভয় পক্ষকে তিরস্কার করলেন এবং ঘোষণা করে দিলেন যে এর পর আবার এই দুই পরিবারের ভিতর যদি বিবাদ হয়, তবে দাঙ্গাকারীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

* * *

বৃদ্ধ মণ্টেগুর একমাত্র পুত্র—তরুণ রোমিও।

ভেরোনায় রোমিওর মত তরুণ আর একটিও নেই। যেমন তার অ্যাপোলোর মত রূপ, তেমনি তার সুমিষ্ট ব্যবহার। সাহসে বীরত্বেও কারও চেয়ে সে কম নয়। এক কথায়, সব দিক দিয়েই সে যুবক সমাজের মাথার মণি।

এই রোমিওর মন এখন বড় খারাপ।

রাজপথে যখন মণ্টেগু-ক্যাপুলেটের দাঙ্গা চলছে—তখন সে নিজের মনের দুঃখে বিচরণ করছে নগর বাহিরের এক উপবনে। দুঃখের আর পার নেই বেচারীর। বুকের ভিতর ধিকিধিকি জ্বলছে দুখের আগুন। আর নাক দিয়ে ঘন ঘন বেরুচ্ছে দীর্ঘনিশ্বাস। শহরের এক বড় বংশের সুন্দরী মেয়ে, নাম তার রোজালিন। তাকে সে বিবাহ করতে চায়, কিন্তু রোজালিন খুশী নয় তার উপরে। কোন উপায়েই রোমিও তার দেখা পাচ্ছে না আজ কয়েকদিন, আর সেই কারণেই মন তার এত খারাপ হয়েছে যে বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশা ত্যাগ করে সে পাগলের মত বনে বনে ঘুরছে। তার দুই বন্ধু বনভোলিও আর মার্কুশিও। দাঙ্গা থামতেই অনেক খোঁজাখুঁজি করে তারা বার করল রোমিওকে। রোজালিনকে উপলক্ষ্য করে তারা দারুণ পরিহাস আর বিদ্রূপ শুরু করল। তবু রোমিওর সেই এক কথা—"কী করে তার একবার দেখা পাই, তার উপায় করে দাও!"

রাজপথে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। একটি লোক এসে একখানা

কাগজ মেলে ধরল তাদের সমুখে। লোকটি এদের চেনে না, চিনলে এদের ছায়াও সে মাড়াত না। সে হল ক্যাপুলেটদের চাকর।

কাগজখানা একটা তালিকা! ভেরোনার যত অভিজাত মহিলা ও পুরুষের নাম তাতে আছে, নেই কেবল মণ্টেগু বংশের সঙ্গে এতটুকু যার সম্পর্ক আছে, এমন কারও নাম! যাহোক, চাকরটাকে সেই তালিকা দিয়ে বৃদ্ধ ক্যাপুলেট আদেশ করেছেন—"যাও, এই সব ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের নেমন্তন্ন করে এসো। আজ রাত্রে আমার বাড়িতে ভোজন করবেন তাঁরা এবং নাচগানের উৎসবে যোগদানও করবেন।"

ক্যাপুলেট খেয়াল করেননি যে তাঁর এই ভৃত্যটি পড়তে জানে না। আর ভৃত্যটিও প্রভুকে সে কথা জানাতে লজ্জা পেয়েছে। টুঁ শব্দটি না করে সে হাত বাড়িয়ে তালিকাটি নিয়েছে এবং রাস্তায় রাস্তায় একে ওকে ধরে তালিকা পড়িয়ে নিচ্ছে।

রোমিও পড়লেন—"সিনিয়র মার্টিনো, তার পত্নী ও কন্যাগণ। কাউন্ট আন্‌স্লেম ও তাঁর ভগ্নীগণ। ভিত্রুভিওর বিধবা পত্নী। সিনিয়র প্ল্যাসেন্‌টিও ও তাঁর ভাগিনেয়ী। আমার কাকা ক্যাপুলেট ও তাঁর স্ত্রীকন্যা, আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী রোজালিন, টাইবল্ট, লুসিও হেলেনা—"

"বাঃ! বহু বড় বড় লোক। কোথায় নিমন্ত্রণ এঁদের?"

ভৃত্য উত্তর করল—"ঐ যে! আমাদের ওখানে!"

"ওখানে? কোন্‌খানে?"

"আমার প্রভুর বাড়িতে!"

"কে তোমার প্রভু?"

"ওঃ হোঃ—তাই জানেন না, বটে? ক্যাপুলেট! ক্যাপুলেট! ক্যাপুলেট কর্তাই আমার মনিব। তাঁর বাড়িতে বিরাট ভোজ! যাবেন! যদি আপনারা মণ্টেগু দলের লোক না হন যাবেন, কিছু ভালোমন্দ খেয়ে আসবেন। সবাইয়ের জন্যই দোর খোলা। যাবেন!"

ভৃত্য চলে গেল। রোমিওর মাথায় ঘুরতে লাগল একটি কথা। রোজালিনের নাম আছে ঐ তালিকায়। আজ সন্ধ্যায় সে ক্যাপুলেট ভবনে যাবে। ঠিক তার মনের কথাটি আন্দাজ করেই, বুঝি ঠাট্টা করেই বেনভোলিও বলল—"যাও না! ক্যাপুলেটদের বাড়ি গিয়ে দেখে এস না তাকে!"

"যাব? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। দেখার পিপাসা মিটিয়ে আসব।"

বেনভোলিও অবাক্। সে শুধু ঠাট্টা করেই ওকথা বলেছিল বই ত নয়! নইলে মন্টেগুর ছেলে ক্যাপুলেটের বাড়ি যাবে! এমন পরামর্শ ত পাগল ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না! কিন্তু রোমিও এ কী বলে? ও কি সত্যিই যেতে চায় সেই শত্রুর পুরীতে? এবার তার ঠাট্টাটা তিতো শোনাল!—"হ্যাঁ যাও, হয়ত ও-পিপাসা একেবারেই মিটবে, শত্রুর তরোয়ালের এক ঘায়—"

কিন্তু মার্কুশিও বলল—"যাওয়াই ভাল। ক্যাপুলেটের বাড়িতে বহু সুন্দরীর আগমন হবে। এমন হয়ত কাউকে দেখতে পাবে—যার সঙ্গে রোজালিনের রূপের তুলনাই হয় না। তোমার মোহ কেটে যাবে চিরদিনের মত।"

মোহ কাটাবার জন্য নয়, দেখার পিপাসা মেটাবার জন্যই রোমিও ক্যাপুলেটভবনে যাওয়া স্থির করল। ছদ্মবেশে যেতে হবে। চিনতে পারলে শত্রুগৃহে তাদের ঢুকতে দেবে না। স্থির হল মার্কুশিও বেনভোলিওরাও সঙ্গে যাবে বন্ধুর।

* * *

রাজবাড়ির মত বিরাট বাড়ি ক্যাপুলেট কর্তার। সেখানে মহা জাঁকজমকে উৎসব হচ্ছে আজ। বড় হলঘর আলোয় আলোয় ঝলমল। তার ভিতর দাঁড়িয়ে ক্যাপুলেট সমাগত অতিথিদের অভ্যর্থনা করছেন। তরুণ তরুণীদের নৃত্যগীতে উৎসাহ দিচ্ছেন। বয়স্কদের সঙ্গে নিজেদের যৌবনের কথা তুলে হাস্যপরিহাসও করছেন মাঝে মাঝে।

কাউন্ট প্যারিস এলেন।

সমস্ত অতিথির ভিতরে এ-বাড়িতে এঁর খাতির বেশী। রূপবান যুবক, অপরিমিত ধনী, ক্যাপুলেটের একমাত্র কন্যা জুলিয়েটকে তিনি বিবাহ করতে চান, অনেকদিন থেকেই এজন্য ঘোরাফেরা করছেন ক্যাপুলেটের কাছে।

ক্যাপুলেটের অনিচ্ছা নেই প্যারিসকে কন্যাদান করতে। তবে মেয়েটির বয়স সবে চৌদ্দ বৎসর, আর ক্যাপুলেটেরও অন্য ছেলে-মেয়েরা সব মরে গিয়েছে, এখন এই একমাত্র সন্তানটিকে এক্ষুনি কাছ ছাড়া করতে মন চাইছে না তাঁর। তাই তিনি আর দুটো বছর অপেক্ষা করতে বলছেন প্যারিসকে। ইতিমধ্যে অবশ্য জুলিয়েটের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারেন প্যারিস তাতে আপত্তি নেই ক্যাপুলেটের, বরং তাঁর স্ত্রীর মুখ দিয়ে জুলিয়েটকে একটা আভাসও তিনি দিয়ে দেবেন যে প্যারিসকেই তাঁর ভাবী স্বামী বলে বাছাই করা হয়েছে, অতএব তার সঙ্গে একটু বেশী মিশলে তাতে দোষ হবে না কিছু।

* * *

গায়ক আর বাদকের মত সেজে তিনটি যুবক এসে সাবধানে প্রবেশ করেছে এই উৎসবের মাঝখানে। বৃদ্ধ ক্যাপুলেট যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, বা ক্যাপুলেটবংশের সুপরিচিত লোকেরা যেখানে ঘোরাফেরা করছেন, সেখানে তারা যাচ্ছে না। বলতে গেলে—পুরুষ মহলকে এড়িয়ে মহিলাদের কাছাকাছিই তারা ঘুরছে ফিরছে।

তাঁরা খুঁজে বেড়াচ্ছে রোজালিনকে।

কিন্তু বেশীক্ষণ আর খোঁজা হল না। একটা অচেনা তরুণীর উপর চক্ষু পড়তেই গতিশক্তি হারিয়ে ফেলল রোমিও। স্থানকাল ভুলে গিয়ে তাকিয়েই রইল তরুণীর পানে, চোখের পলক আর পড়ে না।

বন্ধুরা তাকে এগিয়ে যেতে বলছে, সেদিকে হুঁশ নেই রোমিওর। সে জানতে চাইছে—ঐ মেয়েটি কে।

কিন্তু সে-পরিচয় পাওয়ার আগেই তার নিজের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ল এই শত্রুপুরীতে। বুড়ো ক্যাপুলেটের ভাইপো টাইবল্ট তাকে চিনে ফেলল। অতি বদরাগী স্বভাবের লোক এই টাইবল্ট। মন্টেগুর গন্ধ পেলেই সে ক্ষেপে ওঠে। বাইরে রাজপথে তাদের দেখতে পেলেই সে বিবাদ বাধিয়ে বসে, আর এ তো নিজের এলাকার ভিতরেই। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! ক্যাপুলেটের বাড়ির ভিতর হানা দিয়েছে মন্টেগু? গাইয়ে-বাজিয়ের বেশ পরে? নিশ্চয়ই কিছু খারাপ মতলব আছে। আর না-ও যদি থাকে খারাপ মতলব, এভাবে বিনা নিমন্ত্রণে অনধিকার প্রবেশই তো একটা মহা অপরাধ! এ-অপরাধ ক্ষমা করা যায় না! টাইবল্ট তার ভৃত্যকে বলল—"তরোয়াল নিয়ে আয়!"

দৈবাৎ বৃদ্ধ ক্যাপুলেট এসে পড়লেন সেখানে।

টাইবল্টকে উত্তেজিত দেখে তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। টাইবল্ট বলল রোমিওর কথা। রোমিও?—মন্টেগুর পুত্র? কী জানি কেন, বুড়ো ক্যাপুলেট রাগ করতে পারলেন না ওর উপর। ছেলেটি ভাল। সুন্দর চেহারা! ওকে দেখেছেন তিনি। লোকের মুখে প্রশংসা শুনেছেন ওর। আহা থাক! তাঁর বাড়িতে এসেছে, এই কি শত্রুতা করবার সময়! নিমন্ত্রণ না থাকুক, তবু আজ এই মুহূর্তে রোমিও তাঁর অতিথি। অতিথির অপমান করা অন্যায়। তার গায়ে অস্ত্রাঘাত করা তো পাপ! ওর সঙ্গে বিবাদ করতে ক্যাপুলেট টাইবল্টকে নিষেধ করলেন। কিন্তু ক্ষ্যাপা টাইবল্টকে কি সহজে থামানো যায়? রীতিমত ধমক দিয়ে তাকে শাসন করতে হল।

এত সব ব্যাপার চলছে রোমিওকে উপলক্ষ্য করে। রোমিও কিন্তু কিছুই জানে না। সারা পৃথিবীর কথা ভুলে গিয়ে তার সমস্ত

ভাবনাচিন্তা ঐ তরুণীটির চারিধারে দিশাহারার মত পাক খাচ্ছে অবিরত। সে সুযোগ বুঝে এগিয়ে গিয়েছে ওর পাশে। আলাপ করেছে তার সঙ্গে, দুই একটি কথা তার মুখ থেকেও শুনতে পেয়েছে, তার ফলে অনুভব করেছে স্বর্গসুখ। মেয়েটিও যে তাকে অপছন্দ করেনি, এ-ধারণাও ঠাঁই পেয়েছে রোমিওর মনে।

ধাত্রী এসে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে গেল। রোমিও ঐ বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটির পরিচয়। যা সে শুনল—তাতে হরিষে বিষাদ এল তার অন্তরে। সর্বনাশ! ও নাকি জুলিয়েট! ক্যাপুলেটের একমাত্র কন্যা! যে ক্যাপুলেটের সঙ্গে তাদের বংশের চিরদিন শত্রুতা চলেছে, ও তারই দুহিতা।

রোমিওর চোখে পৃথিবী অন্ধকার মনে হল। ও যে জুলিয়েটকে একবার দেখেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে একেবারে! এখন শত্রুকন্যা বলে তাকে সে ত্যাগ করবে কেমন করে?

না, তা সে কখনোই পারবে না!

ওদিকে জুলিয়েটও সমস্যায় পড়েছে। বড় ভাল লেগেছে এই নতুন-দেখা সুন্দর যুবকটিকে। এর পরিচয় তার জানতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু হঠাৎ কাউকে তা জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জায় বাধে। বুদ্ধি খাটিয়ে সে একটা উপায় ঠিক করেছে। অতিথিরা যখন একে একে বিদায় নিয়ে যাচ্ছে, সে আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বুড়ী ধাত্রীকে নিয়ে। তাকে জিজ্ঞাসা করছে—"ওই যে যায়, ও-যুবকটি কে?"

"ঐ? বুড়ো টাইবিরিওর ছেলে। অনেক টাকা।"

"ঐ যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এই মাত্র, ওটিই বা কে?"

"পেত্রুশিও।"

"তার পরে যে যাচ্ছে, যে লোকটি একবারও নাচেনি?"

"তা তো জানিনে।"

এটা ধাত্রীর চালাকি। জানে সে ঠিকই। মানে, একটু আগেই জেনেছে—টাইবল্টের সঙ্গে যখন ক্যাপুলেটের বচসা হচ্ছিল। কিন্তু

না-জানবার ভান করাই সে উচিত মনে করল। যুবকটি সুন্দর, জুলিয়েটের কাছে ওর পরিচয় না দেওয়াই ভাল। পরিচয় না পেলেই ও ভুলে যাবে যুবকটির কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই মত পালটে গেল বুড়ীর! সে জানে যে অজানাকে জানবার জন্য তরুণীদের মনে একটা দারুণ ঝোঁক আছে। যতক্ষণ এ-যুবকের পরিচয় অজানা থাকবে, ততক্ষণ ও-ছাড়া অন্য চিন্তা থাকবে না জুলিয়েটের। তার চেয়ে ওর পরিচয় দিয়ে দেওয়া যাক। লোকটা যে শত্রুপক্ষীয়—একথা জানলে জুলিয়েট আর ওর কথা চিন্তা করবে না। সে পরিচয় দিল—"মণ্টেগুর একমাত্র ছেলে ঐ হল রোমিও ; তোমাদের পরম শত্রু!"

জুলিয়েট ভয়ানক মুষড়ে গেল, মনে ভাবল—"শত্রু? অবশেষে শত্রুকে ভালবাসতে হল—"

* * * *

সেই রাত্রেই। জুলিয়েট নিজের শয়ন কক্ষের বাতায়নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মাথা গরম হয়ে উঠেছে নানা চিন্তায়। তাই খোলা হাওয়া ভাল লাগছে একটু। নীচে উঁচু প্রাচীরে ঘেরা বৃহৎ বাগান। অন্ধকার সেখানে। জুলিয়েটের বাতায়ন থেকে একটা আলোক-ছটা বেরুচ্ছে, তাতে অত-নীচের সে-অন্ধকার ঘোচে না।

জুলিয়েট সেই গভীর নিশীথে নিজের হৃদয়কে পরীক্ষা করছে। এমন ভাবে ডুবে গিয়েছে চিন্তায় যে মনের চিন্তা মুখ দিয়ে ভাষায় প্রকাশ হচ্ছে। সে তা জানতেও পারছে না।

"রোমিও! রোমিও! তুমি রোমিও হয়ে কেন জন্মালে? মণ্টেগুবংশে কেন জন্মালে? আমাদের মিলনের পথে তোমার আর তোমার বংশের নামটাই একমাত্র বাধা। তোমার নামটা তুমি পালটে ফেল না। ক্ষতি কি তাতে? নামে কি আসে যায়?

গোলাপকে যদি তুমি গোলাপ না বলে অন্য কোন নাম দাও, তাতে কি গোলাপের সুগন্ধ নষ্ট হবে ?"

নীচের অন্ধকার উদ্যানের ভিতর থেকে একটি মধুর স্বর ভেসে এল জুলিয়েটের কানে—"আমায় তুমি যে নামে ডাকবে, তাই আমার নাম। অন্য কোন নামে আমার প্রয়োজন নেই, অন্য কোন নাম আমার কাছে বিষ।"

জুলিয়েট চমকে উঠল—"কে ? কে ওখানে ?"

"রোমিও।"

অন্য অতিথিদের সঙ্গেই রোমিও ক্যাপুলেট প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছিল বটে, কিন্তু জুলিয়েটের থেকে দূরে সে যেতে পারেনি। বন্ধুদের ফাঁকি দিয়ে সে একাকী চলে এসেছে প্রাসাদের পিছন দিকে, আর সেখান থেকে পাঁচিল পেরিয়ে প্রবেশ করেছে একেবারে অন্দরমহলে, দাঁড়িয়েছে এসে মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি।

রোমিও এভাবে বাঘের গুহায় মাথা গলিয়ে দিয়েছে দেখে জুলিয়েট ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কেউ জানতে পারলে এখনই রোমিওর প্রাণ যাবে। ভোজসভায় সে এসেছিল, সেটা বৃদ্ধ ক্যাপুলেট ক্ষমা করেছেন বটে। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে অন্দরমহলের বাগানে তাকে দেখতে পেলে তিনিই আদেশ দেবেন ওকে হত্যা করবার জন্য। জুলিয়েট তাকে কাতর হয়ে অনুনয় করতে লাগল—"যাও, যাও, চলে যাও, এখনই পালাও!"

কিন্তু রোমিও অটল। জুলিয়েট যে তাকে ভালোবেসেছে, এ-কথা শুনবার পরে তার আর ভয়-ডর কিছু নেই। তার মনে হচ্ছে সে সকল বিপদের উপরে, দেবতার দয়া তাকে ঘিরে আছে। সকল বিপদে সেই দেবতারাই তাকে রক্ষা করবেন। রোমিও গেল না, জুলিয়েটকে কয়েকবারই ধাত্রীর ডাকাডাকিতে ভিতরে যেতে হল বটে, কিন্তু কোন বাঁধনই আজ রাতে তাকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারল

রোমিওর ছুরিটা টেনে নিয়ে জুলিয়েট্ আমূল বসিয়ে দিলে নিজের বুকে।

না। ফিরে ফিরে বার বার সে ছুটে এল বাতায়নের পাশে। অনেক রাত পর্যন্ত আলাপন চলল দুজনের ভিতর। কত অর্থহীন মধুর কথা দুজনের মুখে, যুগ যুগ ধরে ভালবাসাবাসির কত শপথের দেওয়া-নেওয়া, দুজনের শপথ দুজনেই শুনল কেবল, সাক্ষী রইল শুধু নিশুতি রাত আর আঁধার আকাশের জ্যোতির্ময় তারকা।

অবশেষে যেতে হল রোমিওকে। রাত্রি আর বেশী নেই।

কিন্তু রোমিও বিদায় নেওয়ার আগেই ওরা ঠিক করে ফেলেছে পরের দিনই ওদের বিবাহ হবে। সকাল বেলাতেই জুলিয়েট তার ধাত্রীকে রোমিওর কাছে পাঠাবে। কোথায় কিভাবে বিয়েটা হবে, সেই সব খবর রোমিও জানাবে ধাত্রীর মুখ দিয়ে।

রোমিও ঘরে ফিরল বটে, কিন্তু নিদ্রার কথা চিন্তাও করতে পারল না। রাতটা ভোর হতেই সে ছুটল সন্ন্যাসী লরেন্স-এর কাছে।

শহরের বাইরে এক গুহায় বাস করেন এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। সাধনভজনে তাঁর দিন কেটে যায়। অবসর সময়ে শিষ্যদের ধর্মোপদেশও দেন।

রোমিও এই সন্ন্যাসীর খুব প্রিয়! লরেন্স ভালবাসেন এই সুন্দর যুবককে তার চরিত্রের জন্য!

রোমিও আজ এই সন্ন্যাসীর কাছে সাহায্য চাইল। জুলিয়েটকে সে বিবাহ করবে। বিবাহ গোপনে হওয়া চাই। কোনমতে এ-কথা আগে যদি প্রকাশ হয়ে পড়ে—মণ্টেগু এবং ক্যাপুলেট—দুই পক্ষ থেকেই আসবে প্রচণ্ড বাধা। তাই লরেন্সকে অনুনয় করে বলল রোমিও—"প্রভু! আপনি আমাদের রক্ষা করুন! এ বিবাহের ব্যবস্থা আপনিই করে দিন।"

লরেন্স সকলেরই ভাল দেখতে চান। তিনি মনে করলেন—বিবাহটা যদি একবার হয়ে যায়, এই উপলক্ষে মণ্টেগু-ক্যাপুলেটদের বহু শত বৎসরের পুরাতন কলহ একদিনে মিটে যাবে। এ-বংশের একমাত্র পুত্র রোমিও, ও-বংশের একমাত্র কন্যা জুলিয়েট! তাদের

সুখী করবার জন্য মাতাপিতাকে চিরদিনের শত্রুতাও ভুলে যেতে হবে।

লরেন্স রাজী হলেন।

সেই প্রভাতেই রোমিওর সঙ্গে ধাত্রী যখন দেখা করল রোমিও জানাল বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। জুলিয়েট যদি বিকাল বেলা সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, তবে তাঁর গুহাতেই রোমিওর সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাবে। সন্ন্যাসী নিজেই বিবাহ দেবেন।

ধাত্রী গিয়ে জুলিয়েটকে সংবাদ দিল। জুলিয়েটও গীর্জায় যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে এল বিকাল বেলায়।

সেই দিনই লরেন্স গোপনে বিবাহ দিলেন রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটের।

* * *

এবার ঘটনার চাকা ঘুরতে লাগল বিপরীত মুখে।

বিবাহের দুই একদিন পরেই ভয়ানক গোলমাল বেধে উঠল। টাইবল্টের সঙ্গে পথে দেখা হল বেনভোলিও এবং মার্কুশিওর। সেদিন রোমিওকেও ক্যাপুলেট ভবনে পেয়েও খুশিমত সাজা দিতে পারেনি টাইবল্ট, অন্তরে সে গুমরে মরছিল। আজ রাস্তায় রোমিওর বন্ধুদের দেখা পেয়ে সে ইতর ভাষায় ওদের গালি দিতে শুরু করল। বেনভোলিও ঝগড়াঝাটি ভালবাসে না, সে হয়ত সব সয়ে যেত, কিন্তু মার্কুশিও সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিল টাইবল্টের গালাগালি।

এই সময়ে রোমিও এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই টাইবল্ট তরোয়াল খুলে তাকে আক্রমণে উদ্যত হল।

কিন্তু রোমিওর আজ জুলিয়েট ধ্যান, জুলিয়েট জ্ঞান। জুলিয়েটের সম্পর্কের যে কোন মানুষ তার কাছে আজ অতি প্রিয়। টাইবল্ট জুলিয়েটের ভাই হয়, তাকে শত্রু বলে ভাবা বা তার দেহে অস্ত্রাঘাত

করার কথা এখন কল্পনাও করতে পারে না রোমিও। যে জুলিয়েটের আত্মীয়, সে ত রোমিওরও আত্মীয়।

তাই রোমিও মিষ্ট কথায় টাইবল্টকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

এতে ফল হল বিপরীত। টাইবল্ট মনে করল—রোমিও ভয় পেয়েছে। তার স্পর্ধা আরও বেড়ে উঠল। সে নানারকমের অপমানের কথা বলতে লাগল রোমিওকে এবং মণ্টেগু পরিবারকে লক্ষ্য করে।

রোমিওর প্রতিজ্ঞা সে আজ কিছুতেই রাগ করবে না টাইবল্টের উপর। কিন্তু মার্কুশিও বিচলিত হল। রোমিও তার বন্ধু, মণ্টেগু বংশ তার আত্মীয়। এদের লক্ষ্য করে এরকম জঘন্য অপমানের কথা অসহ্য হল তার। সে অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল টাইবল্টকে। ঘোর যুদ্ধ বেধে উঠল।

রোমিও দেখল সর্বনাশ! মার্কুশিও তার নিজের বন্ধু, টাইবল্ট তার পত্নী জুলিয়েটের ভাই। যে কেউ নিহত বা আহত হলে তার যা ক্ষতি হবে সে কোনমতেই পূরণ করা যাবে না। সে ওদের যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা করতে লাগল। উভয়ের অস্ত্রের মুখে নিজে লাফিয়ে পড়ল।

মার্কুশিও তরোয়াল টেনে নিল বটে, কিন্তু টাইবল্ট নিল না। রোমিওর আড়ালে থেকে সে মার্কুশিওকে দারুণ আঘাত করল। মার্কুশিও পড়ে গেল মাটিতে। দেখতে দেখতে তার প্রাণ বেরিয়ে গেল।

চোখের সমুখে বন্ধু মারা গেল বিনা দোষে, নিষ্ঠুর টাইবল্টের হাতে? রোমিওর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল এবার! সে ভুলে গেল যে টাইবল্টের সঙ্গে জুলিয়েটের একটা খুব নিকট সম্পর্ক রয়েছে। তরোয়াল নিয়ে সে আক্রমণ করল টাইবল্টকে। সত্যি সত্যি রোমিওর মত বীর ত সারা শহরে কেউ নেই! তার আঘাতে

মুহূর্তের মধ্যে শত্রু ভূপতিত হল। রোমিওর তরবারি তার বুকের ভিতর বসে গেল একেবারে।

তখন জ্ঞান ফিরে এল রোমিওর। এ কী সর্বনাশ হয়ে গেল! জুলিয়েটকে সে মুখ দেখাবে কেমন করে?

কিন্তু দাঁড়িয়ে দুঃখ করবার সময় নেই আর। চারদিক থেকে লোকজন এসে পড়েছে। ভেরোনার রাজাও আসছেন। বেনভোলিও রোমিওকে দূরে সরিয়ে দিল তাড়াতাড়ি।

রাজা এলেন। এই সেদিনই তিনি ঘোষণা করে গিয়েছেন যে রাজপথে যে-কেউ দাঙ্গা করবে, তার প্রাণদণ্ড হবে। আর আজই সে আদেশ অগ্রাহ্য করে এরা দু'-দুটো খুন করেছে প্রকাশ্য রাজপথে? এত সাহস!

বেনভোলিওর কাছে সমস্ত কথা শুনলেন রাজা।

টাইবল্টই প্রথম আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সে তো মারাই গিয়েছে, তার অপরাধের সাজা ত হয়েই গিয়েছে!

দ্বিতীয় আক্রমণকারী রোমিও। তবে তার পক্ষ থেকে এইটুকু বলবার আছে যে চোখের উপর বন্ধুকে মারা পড়তে দেখে শোকে সে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল, টাইবল্টকে যখন সে বধ করে, তখন তার মাথা ঠিক ছিল না। রাজা তাই প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন। আদেশ দিলেন,—ভেরোনা থেকে এই মুহূর্তে সে চলে যাক। এখানে তাকে যদি আর দেখা যায়, তখুনি তার প্রাণ যাবে।

বৃদ্ধ মন্টেগুর চোখের জল দেখে রাজার মন একটুও ভিজল না।

জুলিয়েটকে ফেলে রেখে রোমিওকে সেই মুহূর্তে নির্বাসনে চলে যেতে হল। একবার শেষ সাক্ষাৎ করে বিদায় নিয়ে যাওয়ারও সময় হল না। তখুনি ভেরোনা ত্যাগ করে তাকে গিয়ে আশ্রয় নিতে হল মাণ্টুয়া নগরে।

• • • •

দুঃখে হৃদয় ভেঙে গেল জুলিয়েটের।

বিবাহের ঠিক পরেই এ কী দুর্ঘটনা ঘটল তার ভাগ্যে?

চোখের জল আর থামে না তার। ক্যাপুলেটের বাড়ির অন্দর-মহলে ঢুকলেই যে-কেউ শুনতে পাবে জুলিয়েটের কান্না আর দীর্ঘ নিশ্বাস।

লোকে মনে করে—টাইবল্টের মৃত্যুর জন্যই তার এই শোক। রোমিওর জন্য যে তার কোন দুঃখ হতে পারে, এমন সন্দেহ তো কারও মনেই আসেনি! রোমিওকে ও চিনত বলেই জানে না কেউ।

মা, বাপ, আপন জনেরা জনে জনে অনেক বোঝালেন তাকে —কিছুতেই তার শোকের নিবৃত্তি হয় না, কিছুতেই থামে না তার অশ্রু।

ক্যাপুলেট ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। একমাত্র সন্তান ঐ জুলিয়েট —তাকে অবিরত চোখের জল ফেলতে দেখে তাঁর জীবনের সুখ-শান্তি সব লোপ পেয়ে গেল।

তিনি একটা উপায় স্থির করলেন অবশেষে। প্যারিসকে তিনি কথাই দিয়ে রেখেছেন যে জুলিয়েটের সঙ্গে তার বিবাহ দেবেন। ঠিক করলেন আর তিনি বিলম্ব করবেন না। দুই একদিনের ভিতরই বিবাহটা সমাধা করে ফেলবেন। বিবাহের আনন্দে টাইবল্টের শোক নিশ্চয়ই ভুলে যাবে জুলিয়েট।

সবাই তৈরী হল—বিবাহের উপলক্ষে জমকালো রকমের একটা উৎসব করবার জন্য। কেবল মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল অভাগিনী জুলিয়েটের। সে তো বলতে পারে না যে আগেই তার বিবাহ হয়ে গিয়েছে! সে কেবল অনুনয় করতে লাগল—বিবাহ পিছিয়ে দেওয়া হোক কিছুদিনের জন্য, তার মন বড় অস্থির আছে, এখন বিবাহ করতে হলে তাতে সে কিছুমাত্র আনন্দ পাবে না।

কিন্তু সব বড়লোক যেমন হয়, ক্যাপুলেটও তেমনি ভীষণ একগুঁয়ে। তিনি একবার যে হুকুম দিয়েছেন, তাতে কেউ আপত্তি তুলবে, এটা সহ্য করতে ক্যাপুলেট নারাজ! জুলিয়েটের আপত্তিতে মোটেই কান দিলেন না তিনি। কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন জুলিয়েটকে। বিবাহ করতেই হবে তাকে। না করলে, তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন তিনি। জীবনে আর তার মুখ দেখবেন না।

জুলিয়েট নিরুপায় হয়ে পড়ল। কী করবে সে? এ বিপদে তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই। একটা পরামর্শ দেবার লোক পর্যন্ত নেই।

হঠাৎই তার মনে হল সন্ন্যাসী লরেন্স-এর কথা। আছেন, সাহায্য করবার মত ঐ একটি লোক আছেন। জুলিয়েটের বিবাহও তো তিনিই দিয়েছিলেন! রোমিওকে তিনি স্নেহ করেন। তার খাতিরে অবশ্যই সন্ন্যাসী জুলিয়েটকে এ বিপদে সাহায্য করবেন।

জুলিয়েট সেইদিনই লরেন্স-এর সঙ্গে দেখা করল।

সব শুনে সন্ন্যাসী বললেন—"এ বিপদে অবশ্যই আমি উদ্ধার করব তোমাকে। প্যারিসের সঙ্গে বিবাহে তুমি রাজি হয়ে যাও, আর কান্নাকাটিও বন্ধ কর। একটা ওষুধ আমি তোমাকে দিচ্ছি। বিবাহের জন্য যে দিন স্থির হবে, তার আগের রাত্রে এই ওষুধটি তুমি খাবে। এর ফলে বাইরে থেকে তোমাকে মৃত বলে মনে হবে। কেউ কোনমতেই বুঝতে পারবে না যে তোমার দেহের ভিতর প্রাণ আছে। তারপর পিতা বাধ্য হয়েই তোমার দেহ সমাধিস্থ করবার জন্য গীর্জায় পাঠাবেন। কবরখানার মাঠে ক্যাপুলেট বংশের নিজস্ব ঘর আছে একটা। সেই ঘরেই তোমার দেহ রাখা হবে। তোমার জ্ঞান ফিরে আসবে—ওষুধ খাওয়ার চব্বিশ ঘণ্টা পরে, অর্থাৎ রাত্রিকালে।

জ্ঞান ফিরে আসবার পরেই তুমি দেখতে পাবে রোমিও এসে তোমার পাশে অপেক্ষা করছে। সে তোমায় মাণ্টুয়ায় নিয়ে যাবে। সব ব্যবস্থা আমি করছি। বিশ্বাসী লোক দিয়ে রোমিওকে সব খবর আমি পাঠাচ্ছি এখনই।"

জুলিয়েট যেন মৃতদেহে প্রাণ ফিরে গেল। নৈরাশ্য ঘুচে গিয়ে তার হৃদয়ে নতুন আশার আলো দেখা দিল। সে ঘরে ফিরে এল হাসি মুখে। তার দিকে তাকিয়ে ক্যাপুলেট অবাক্ হয়ে গেলেন। জুলিয়েট বলল—"বাবা! আমি প্যারিসকে বিয়ে করতে রাজী। তোমার কথার অবাধ্য হব না।"

ভিতরের কথা না বুঝে ক্যাপুলেট সস্নেহে তাকে কাছে টেনে এনে আশীর্বাদ করলেন। সন্ন্যাসী লরেন্স-এর সদুপদেশেই মেয়ের এই সুমতি হয়েছে মনে করে তাঁর উপর খুব কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলেন তিনি।

ক্রমে বিবাহের আয়োজন সম্পূর্ণ হল। কাল বিবাহ।

রাত্রিকালে জুলিয়েট ঔষধ সেবন করল—যে-ঔষধ সে পেয়েছিল সন্ন্যাসীর কাছে।

সকাল বেলা বিবাহের বাঁশি বেজে উঠল ক্যাপুলেট ভবনে। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য। একটু পরেই অন্তঃপুর থেকে উঠল বহুলোকের করুণ রোদনের সুর। উৎসবের বাঁশি ভয় পেয়ে থেমে গেল সে রোদন শুনে।

জুলিয়েটকে যারা ঘুম থেকে জাগাতে গিয়েছিল, তারা তাকে দেখতে পেয়েছে মৃত। একী সর্বনাশ!

বৃদ্ধ ক্যাপুলেট, ক্যাপুলেটের পত্নী, আত্মীয়-বন্ধু দাস-দাসী হাহাকার করতে লাগল সবাই মিলে। এমন সর্বনাশ যে ঘটতে পারে, তা কল্পনাও করতে পারেনি কেউ!

কিন্তু কাঁদতে কাঁদতেও কর্তব্য করতে হয়। কন্যাকে সমাধি দেবার জন্য গীর্জায় পাঠিয়ে দিলেন ক্যাপুলেট। যথারীতি ক্যাপুলেট

বংশের নিজস্ব সমাধি-মন্দিরে দেহটি এক রাত্রি থাকবে। তার পরদিন দেওয়া হবে সমাধি।

ইতিমধ্যে লরেন্স লোক পাঠিয়েছেন রোমিওর কাছে। সে লোক সব কথা তাকে খুলে বলবে, এবং ঠিক সময়ে রোমিওকে কবরখানার মাঠে নিয়ে আসবে। এদিকে লরেন্সও থাকবেন তখন জুলিয়েটের পাশে, রোমিওর সঙ্গে জুলিয়েটকে তিনি মাণ্টুয়ায় রওনা করে দেবেন।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

এমনি দুর্ভাগ্য, লরেন্স-এর লোক রোমিওর কাছে পৌঁছোবার আগেই অন্য একটি লোকের মুখে রোমিও শুনেছে জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ। আকাশ ভেঙে পড়েছে রোমিওর মাথায়। নেই? জুলিয়েট নেই? তা হলে আর কিসের আশায় বেঁচে থাকবে রোমিও? কিছু মারাত্মক বিষ যোগাড় করে নিয়ে তক্ষুনি সে রওনা হল ভেরোনার দিকে।

যখন লরেন্স-এর লোক মাণ্টুয়ায় পৌঁছোলো, তখন সেখানে রোমিওকে আর দেখতে পেল না।

এদিকে রাত্রি এল।

হতভাগ্য প্যারিস! সে সত্যই ভালবেসেছিল জুলিয়েটকে। বিবাহের আগের রাত্রে তাকে হারিয়ে সেও পাগলের মত হয়ে গিয়েছে। জুলিয়েটের মৃতদেহকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য সেও রাত্রিবেলা এসেছে ক্যাপুলেটদের সমাধি-মন্দিরে।

ঠিক সেই সময়ে এসে পড়েছে রোমিও-ও।

সমাধি-মন্দিরের দরজায় রোমিওকে দেখেই সে চমকে উঠল। রোমিও এখানে? ক্যাপুলেটদের চিরশত্রু রোমিও? প্যারিস ভাবল—নিশ্চয় কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সে এখানে এসেছে। টাইবল্টকে হত্যা করে সে ক্ষান্ত হয়নি। আরও নতুন কী ক্ষতি সে করতে চায় কে জানে। প্যারিস উপস্থিত থাকতে সে তা কখনও

করতে পারবে না। বিবাহ যদিও হয়নি, তবু জুলিয়েটকে প্যারিস নিজের বলেই জানে। তার বংশকে কলঙ্কের হাত থেকে প্যারিস অবশ্য রক্ষা করবে। সে দ্বিধা না করে আক্রমণ করল রোমিওকে।

দুর্ভাগ্য তার, রোমিওর অস্ত্রে নিজেই নিহত হয়ে সে ধরাশায়ী হল।

তখন রোমিও প্রবেশ করল সমাধি-মন্দিরে। কাঠের কফিনের ভিতর জুলিয়েটের দেহ শোয়ানো রয়েছে। কফিন খুলে সে জুলিয়েটকে দেখল। তখনও জুলিয়েট জাগেনি, মৃতের মত পড়ে আছে। তাকে প্রাণভরে একবার দেখে নিয়ে তার পাশে শুয়েই রোমিও বিষ পান করল। দেখতে দেখতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল সে।

হায় ভাগ্য! তার একটু পরেই জুলিয়েটের জ্ঞান ফিরে এল। ফিরে আসতেই সে দেখল—তার রোমিও তার পাশেই শুয়ে আছে! কিন্তু—কিন্তু সে যে মৃত!

হাহাকার করে উঠল জুলিয়েট। রোমিওর সঙ্গে মিলিত হবে, বড় আশায় সে বুক বেঁধেছিল যে! সে আশা এভাবে গুঁড়িয়ে যেতে দেখে সে আর সইতে পারল না। রোমিওর কটি থেকে তার ছুরিকা টেনে নিয়ে আমূল বসিয়ে দিল নিজের বুকে।

তার একটু পরেই এলেন সন্ন্যাসী লরেন্স। তিনি নির্দিষ্ট সময়েই এসেছেন। কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্য তার আগেই পাশা উলটে দিয়েছে। যে-নাটককে মিলনে শেষ করতে চেয়েছিলেন সন্ন্যাসী, তা শেষ হয়েছে রোমিও-জুলিয়েট দুজনেরই মরণে।

তারপর রাজা এলেন, ক্যাপুলেট এলেন, মণ্টেগু এলেন, শহরের ছেলে বুড়ো সবাই একে একে এল। লরেন্স তাদের সবাইকে বললেন—রোমিও-জুলিয়েটের প্রেমের কথা এবং মৃত্যুর কথা।

তখন দুঃখ আর শোক! অশ্রু আর হাহাকার!

এতদিনে অনুতপ্ত ক্যাপুলেট আর অনুতপ্ত মণ্টেগু চোখের জলের ভিতর দিয়ে মিলিত হলেন শত শত বৎসরের শত্রুতা ভুলে।

———

কিং লীয়ার

ব্রিটেনের রাজা লীয়ার।

সারাজীবন সুখে রাজত্ব করে এখন তিনি বুড়ো হয়েছেন। দেশ শাসনের দায়িত্ব আর তিনি বহন করতে চান না। সব ঝামেলা হাত থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিরিবিলি বসে আরাম করাই তাঁর কামনা।

পুত্র তাঁর নেই, আছে তিনটি মাত্র কন্যা—গনেরিল, রিগান আর কর্ডেলিয়া। বড় কন্যা দুটির বিবাহ দিয়েছেন বড় ঘরের যোগ্য পাত্রেই। বড় জামাই ডিউক অব আলবানি, মেজ ডিউক অব কর্নওয়াল। ছোট মেয়েটির বিবাহ এখনও দেননি, তবে তাঁকে বিবাহ করবার আশায়, ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউক দুজনেই ঘন ঘন এদেশে আসছেন। ঠিক এই সময়টাতেই তাঁরা দুজনেই লীয়ারের রাজসভায় উপস্থিত রয়েছেন অতিথিরূপে।

লীয়ারের ইচ্ছা—সমস্ত রাজ্য তিন কন্যাকে ভাগ করে দিয়ে নিজে পালা করে তাদের গৃহে গিয়ে বাস করবেন।

এই মতলব মনে মনে স্থির করে একদিন তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর তিন কন্যা, দুই জামাতা এবং ছোট মেয়েকে বিবাহ করবার জন্য যাঁরা এসেছেন, সেই ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউককে। নিজের সভাসদ, পারিষদ ও দেশের বড় লোকদেরও ডাকালেন তিনি।

দেশের মানচিত্র খুলে বসেছেন রাজা।

প্রথম কাছে ডাকলেন গনেরিলকে। বললেন,—"মা, তুমি আমার বড় মেয়ে, তোমার উপরই আমার আশা-ভরসা বেশী। তোমার নিজের মুখে আমি শুনতে চাই—তুমি আমায় কতখানি ভালবাসা। তোমার উত্তর শুনবার পরে স্থির করব যে রাজ্যের কোন্ কোন্ অংশ তোমায় দেওয়া উচিত।"

এগিয়ে এলেন গনেরিল। মেয়েটির বিষয়বুদ্ধি খুব ধারালো। লীয়ারকে খুশী করে কিভাবে রাজ্যের ভালো ভালো জায়গাগুলি নিজের ভাগে টেনে আনা যাবে, তা বিলক্ষণ জানা আছে তাঁর। তিনি বলতে লাগলেন—"আমার ভালবাসা? পিতা, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নেই, যার সঙ্গে আপনার উপর আমার ভালবাসার তুলনা হতে পারে। আপনাকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না, চাই না, ভালবাসি না। আপনি আমার জীবনের আনন্দ, চোখের তারা! লবণহীন ব্যঞ্জন যেমন বিস্বাদ, আপনাকে কাছে না পেলে জীবনও আমার কাছে তেমনি বিস্বাদ হয়ে যাবে।"

বাঃ! এই রকমই তো শুনবার প্রত্যাশা করেছিলেন লীয়ার! গনেরিল সত্যিই তাঁকে ভালবাসে তাহলে! অতএব রাজ্যের সবচেয়ে ভাল অংশটি তাঁরই পাওয়া উচিত। মানচিত্রের উপর দাগ দিয়ে তিনি মন্ত্রী, সেনাপতি, আর্ল, ডিউক যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, সবাইকে দেখিয়ে দিলেন যে রাজ্যের কোন্ কোন্ অঞ্চল গনেরিলের হস্তে তিনি দিয়ে দিতে চান!

তারপর ডাক পড়ল রিগানের। চাতুরীতে তিনিও তাঁর বড়

বোনের চেয়ে কম যান না। তিনি আরও চড়া পর্দায় তোষামোদ শুরু করলেন। বললেন,—"পিতা! আমার ভালবাসার কথা আর নিজ মুখে কি বলব? দিদি যা বলেছেন—সে আর এমন কী ভালবাসা? তারও উপরকার ভালবাসা যদি কিছু থাকে—অবশ্যই তা আছে,—তবে আপনার প্রতি আমার ভালবাসা সেইরকম। আপনাকে ছাড়া কোন আনন্দ আমার নেই, কল্পনাই করতে পারিনে কোন আনন্দের কথা।"

লীয়ার হাতে স্বর্গ পেলেন। এমন সব কন্যা যাঁর, সে নিশ্চয়ই ভাগ্যবান। লীয়ার মানচিত্রের আর একটা অংশ রিগানের জন্য চিহ্নিত করে দিলেন।

তারপর তিনি ডাকলেন কর্ডেলিয়াকে। তাঁর ছোট মেয়ে, আনন্দের পুতলী। তিনটি মেয়ের মধ্যে নিজে তিনি এইটিকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাঁর মুখ থেকে যে আরও মধুর ভালবাসার কথা শুনতে পাওয়া যাবে, এতে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি সাদরে কাছে ডেকে বললেন—"এইবার শুনি, কর্ডেলিয়া, তুমি কি বলতে চাও!"

বেচারী কর্ডেলিয়া! তাঁর বরাত মন্দ—রাজ্যের লোভে লজ্জা ভয় ভদ্রতা বিবেক সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেন নি। স্বভাবতঃই তিনি তোষামোদকে ঘৃণা করেন। তার উপর আজ এই বিশেষ ক্ষেত্রে—স্নেহময় পিতাকে ঠকাবার জন্য তোষামোদের কথা বলা—তাঁর চোখে এর চেয়ে ঘৃণার জিনিস আর কিছু হতে পারে না। অবশ্য পিতাকে তিনি সত্যই ভালবাসেন। কিন্তু তাই বলে কি জেনে শুনে কতকগুলো মিথ্যা কথা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে হবে? এ কাজ করলে তিনি কি নিজের চোখেই ছোট হয়ে যাবেন না?

লীয়ার হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন—"তোমার কী বলবার আছে কন্যা?" অনেক কিছু গালভরা মিষ্টি কথা শুনবার প্রত্যাশা তাঁর, তা তাঁর গলার স্বর শুনেই বোঝা যায়।

কিন্তু কর্ডেলিয়া? মুখ দিয়ে তাঁর কথা বেরুতে চায় না, অনেক কষ্টে মাথা হেঁট করে বললেন—"কিছু না!"

"কিছু না!"

লীয়ারের মনে হল তিনি ভুল শুনছেন। তিনি নিজে তিন মেয়ের ভিতর কর্ডেলিয়াকে ভালবাসেন বেশী। বিশ্বাসও করেন যে, তিন মেয়ের ভিতর কর্ডেলিয়াই তাঁকে বেশী ভালবাসে। কিন্তু এ কী হল? সেই কর্ডেলিয়াই সকলের সামনে বলছে—"কিছু না?" কিছু বলবার নেই? পিতাকে ভালবাসে কিনা, এ-প্রশ্নের জবাবে কিছুই সে বলতে চায় না?

তবে কি তিনি কর্ডেলিয়াকে ভুল বুঝেছিলেন এতদিন!

তিনি পুনরায় বললেন—"ভেবে বল কর্ডেলিয়া! 'কিছু-না' বললে পাওনার বেলায়ও 'কিছু-না' হয়ে যেতে পারে।"

কর্ডেলিয়া কি লোভের বশে তোষামোদ করবেন? না, ভয় পেয়ে যা-তা বলবেন? তিনি ধীর স্থির বিনীতভাবে বলতে লাগলেন —"বাবা! আপনি জন্মদাতা। পরম স্নেহে আমায় এতদিন লালন-পালন করেছেন আপনি, দিয়েছেন সকল বিষয়ে সুশিক্ষা। সেজন্য যতটা কৃতজ্ঞতা আমার থাকা উচিত, তা ষোল-আনাই আমার আছে। যতটুকু ভক্তি আপনার উপর আমার থাকা উচিত, তার চেয়ে একতিলও কম আমার নেই। এর চেয়ে বেশী আর কী বলব? দিদিরা অনেক কথা বলেছেন, সে সব কথা বলা আমি সংগত মনে করি না। তাঁরা বলেছেন—আপনাকে ছাড়া আর কাউকে তাঁরা ভালবাসেন না। তাই যদি হয়, তবে তাঁরা বিবাহ করলেন কেন? স্বামীকে দেবার জন্য এতটুকু ভালবাসাও কি তাঁদের অন্তরে অবশিষ্ট নেই? তাই যদি না থাকে, তাঁরা স্বামীর সঙ্গে একসাথে বাস করেন কেমন করে? তারও চেয়ে বড় কথা, বিবাহটাই বা তাঁরা করেছিলেন কেন?"

লীয়ার রেগে উঠলেন। যুক্তি শুনবার জন্য তিনি বসেননি,

বসেছেন তোষামোদ শুনতে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এই তা হলে তোমার শেষ কথা? যেটুকু ভালবাসা কর্তব্য, ততটুকুই তুমি ভালবাস তোমার পিতাকে? তার চেয়ে একটুও বেশী নয়? কর্তব্যের তাগিদ ছাড়া হৃদয়ের দরদ নেই?"

কর্ডেলিয়ার আর বলবার কিছু নেই।

লীয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালেন। রাজ্যের তিন ভাগের এক ভাগ কর্ডেলিয়াকে দেবার জন্যে আলাদা করে রেখেছিলেন, তার ভিতর দিয়ে দীর্ঘ রেখা টানলেন একটা। দুদিকের দুটি ভাগ বড় দুই মেয়ের ভিতর বেঁটে দিলেন। দেশের অর্ধেক হল গনেরিলের, অর্ধেক হল রিগানের!

রেগে চেঁচিয়ে তিনি সবাইকে শুনিয়ে বললেন—"কর্ডেলিয়াকে আমি ত্যাগ করছি। আমার উপর যার এতটুকু স্নেহ নেই, সে কন্যার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক রইল না আর। এক ইঞ্চি জমিও ওকে আমি দেব না, বিবাহের সময় এক কানাকড়ি যৌতুকও দেব না ওকে।"

পুরোনো সভাসদদের ভিতর কেণ্ট-এর আর্ল এর প্রতিবাদ না করে পারলেন না। অতি বিচক্ষণ লোক এই কেণ্ট। রাজাকে তিনি ভালবাসেন, ভক্তিও করেন। কিন্তু দরকার হলে রাজার কাছে প্রতিবাদ জানাতেও তিনি ভয় পান না।

কেণ্ট স্পষ্ট বললেন—"মহারাজ! আপনি ভাল করে বিবেচনা করুন। যেভাবে রাজ্য ভাগ করে দিতে চাইছেন আপনি, সেইটেই অনুচিত। নিজে যতদিন বেঁচে থাকবেন, ক্ষমতা নিজের হাতে রাখা উচিত। আর যদি রাজ্য মেয়েদের দান করতেই হয়, এভাবে ছোট রাজকুমারীকে বঞ্চিত করার কোন যুক্তি নেই। আপনার প্রতি তাঁর ভক্তি নেই বলে এই যে আপনার ধারণা, এ একেবারেই ভুল। কর্ডেলিয়া অতি সুশীলা, মনের ভাব ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন। তা নইলে তিনি যে মনে প্রাণে

আপনাকে ভক্তি করেন, ভালবাসেন অতি গভীরভাবে এ আমরা সকলেই বুঝি।"

লীয়ার ভয়ানক বিরক্ত হলেন কেন্ট-এর উপর। রাজার কথার উপর কথা? তিনি আদেশ করলেন—"তুমি চুপ কর আর্ল। আমি যা ব্যবস্থা করেছি, তা আর নড়চড় হবে না। কর্ডেলিয়াকে আমি ত্যাগ করেছি।"

"আপনি অন্যায় করেছেন"—জোর গলায় বলে উঠলেন কেন্ট—"এখনও এ-অন্যায় আদেশ বাতিল করুন।"

"তুমি যদি চুপ না কর, তোমায় আমি নির্বাসিত করব।"

"নির্বাসনের ভয়ে সত্য ও সংগত কথা বলতে ভীত হব না। কিসে আপনার সত্যকার ভাল হবে, আপনি তা চোখে দেখতে পাচ্ছেন না। সোনা ফেলে কাচের আদর করছেন। আপনার চোখে আঙুল দিয়ে আপনার ভুল যদি না দেখিয়ে দিই, তবে বৃথাই এতদিন আপনার নিমক খেয়েছি।"

লীয়ার আর সহ্য করতে পারলেন না। দিগ্‌বিদিক জ্ঞান হারিয়ে হুকুম দিলেন—কেন্টকে এক্ষুনি দেশ ছেড়ে নির্বাসনে যেতে হবে।

মাত্র একটি লোকেরই সত্যিকার দরদ ছিল রাজার উপরে। তিনিও নির্বাসনে চলে গেলেন।

তখন রাজা কাছে ডাকলেন বার্গাণ্ডির ডিউক ও ফ্রান্সের রাজাকে। —"আপনারা দুজনেই ঐ কর্ডেলিয়াকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন। দেখছেন তো, আমি ওকে ত্যাগ করেছি, ওর বিবাহে কিছুমাত্র যৌতুক দিতে আমি রাজী নই। এ-অবস্থায় আপনাদের ভিতর কেউ কি ওকে বিবাহ করতে রাজী আছেন এখন?"

বার্গাণ্ডির ডিউক বললেন—"আপনার পুত্র নেই, আপনার মৃত্যুর পরে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ ছোট রাজকন্যা পাবেন—এই আশাতেই আমি ওঁকে বিবাহ করতে চেয়েছিলাম। তা যদি না দেন—তবে আমার পক্ষে এ বিবাহ করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব"—ফ্রান্সের মহানুভব রাজা এগিয়ে এসে বললেন—"আমার পক্ষে তা খুবই সম্ভব। আমার নিজের রাজ্য আছে, ছোট্ট ইংলণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ না পেলেও আমার চলবে। আমি চাই একটি সুশীলা পত্নী। কর্ডেলিয়ার অন্তর যে কত মহৎ তা আমি দেখতে পাচ্ছি, বুঝতে পারছি, তাঁর মত সুশীলাকে পত্নীরূপে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে-ভাগ্যকে মুঠোর ভিতর পেয়ে আমি ছেড়ে দেব না। চল কর্ডেলিয়া—আমি তোমায় ফ্রান্সে নিয়ে যাই। সেইখানেই হবে আমাদের বিবাহ।"

লীয়ার বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হয়ে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। সঙ্গে গেলেন সভাসদ পারিষদ সবাই। শুধু মাত্র তিন ভগ্নী রইলেন সেখানে—গনেরিল, রিগান, কর্ডেলিয়া। আর রইলেন ফ্রান্সের রাজা।

"তোমার ভগ্নীদের কাছে বিদায় নাও কর্ডেলিয়া"—রাজা বললেন তাঁর ভাবী পত্নীকে।

কর্ডেলিয়া চোখের জল ফেলে বোনেদের কাছে অনুনয় করলেন—"পিতাকে ফাঁকি যা দেবার, তা দিয়েছ। এখন শুধু এইটুকু প্রার্থনা করি—তাঁর কোন অযত্ন তোমরা করো না।"

রেগে ওঁরা বললেন—"তোমায় আর উপদেশ দিতে হবে না, পিতার সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য আমরা জানি। তুমি যাও, তোমার ভাবী স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্য ঠিকমত করো গিয়ে।"

* * *

এর পর গনেরিল আর রিগান তাঁদের নিজের নিজের রাজ্যের ভিতর চলে গেলেন। লীয়ার বন্দোবস্ত করেছেন—পালা করে একমাস গনেরিলের বাড়িতে থাকবেন, একমাস রিগানের বাড়ি। নিজের বলতে তিনি শুধু রেখেছেন 'রাজা' উপাধি আর একশো নাইট। সেকালের ইউরোপীয় বীরদের সাধারণ নাম ছিল 'নাইট'। রাজ্যশাসনের ব্যাপারে এঁরাই ছিলেন রাজাদের প্রধান সহায়।

এখন লীয়ারের রাজ্য নেই, কাজেই এঁরাও রাজার মতই বেকার।

ঠিক হয়েছে—রাজার সঙ্গে সঙ্গে এই একশো নাইটও একমাস গনেরিলের বাড়িতে, একমাস রিগানের বাড়িতে বাস করবেন।

প্রথম মাস গনেরিলের বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা।

দু'চারদিন সেখানে রাজার বেশ ভাল ভাবেই কাটল। তারপরই গনেরিল ক্রমশঃ নিজমূর্তি ধারণ করতে লাগলেন! কোনদিনই তাঁর এমন মতলব ছিল না যে বুড়ো রাজাকে চিরকাল ঠাকুর দেবতার মত মাথায় করে রাখবেন, বা তাঁর সঙ্গের ঐ একশোটা নাইটের খাওয়া-পরা-ফূর্তির রাক্ষুসে খরচা বছরে ছয়মাস ধরে বহন করবেন। তিনি নিজের ভৃত্যদের টিপে দিলেন—ঐ নাইটগুলোকে যাতে তারা বিশেষ খাতির না দেখায়। তারা বিদায় হলেই যে এই বাড়ির লোকেরা বাঁচে, এটা যেন তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেওয়া হয়।

ইঙ্গিত পেয়ে ভৃত্যেরা মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। লীয়ারের একটি অতি প্রিয় বিদূষক ছিল। সে যেমন রসিক তেমনি জ্ঞানী। হাস্যকৌতুকের ভিতর দিয়ে অতি মূল্যবান সব জ্ঞানের কথা তার মুখ থেকে সদাই বেরুতো। এই বিদূষকটিকে একদিন তারা অপমান করল।

রাজা এতে দারুণ ক্রুদ্ধ হলেন। অপরাধী ভৃত্যটিকে প্রহার করলেন তিনি নিজের হাতে। আগুন জ্বলে উঠল। গনেরিল তাঁর সর্দার-ভৃত্য অস্‌ওয়াল্ডকে হুকুম দিলেন—"বুড়ো রাজার খাতির রেখেও আর তোমাদের চলবার দরকার নেই।"

সেদিন রাজার সমুখে এল এক প্রৌঢ় ব্যক্তি—সে চায় একটা চাকরি। নাম তার কেইয়াস। এ আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী কেণ্টের আর্ল। প্রভুকে তিনি এতই ভালবাসেন যে তাঁকে ছেড়ে বিদেশে বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। কন্যাদের আশ্রয়ে রাজার দিন যে

সুখে কাটবে না, এ তিনি আগে থাকতেই অনুমান করেছিলেন। বুড়ো বয়সে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে রাজা তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু এখন রাজাকে যদি দুঃখে পড়তে হয়, তবে তাঁর সেবা করবার জন্য কেণ্টকে যে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতেই হবে। তাই নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে তিনি গরিবের বেশে লীয়ারের কাছেই ফিরে এলেন আবার।

কেইয়াসের সঙ্গে লীয়ার কথা কইছেন, এমন সময় অস্‌ওয়াল্ড এসে নানা রকম অসভ্যতা করতে লাগল। রাজার প্রতি সামান্য ভৃত্যের এই অশিষ্ট আচরণ কেণ্ট সহ্য করতে পারলেন না। পদাঘাত করে তাকে দূর করে দিলেন।

এতে প্রীত হয়ে রাজা বললেন—"তুমি থাক কেইয়াস, আমার কাছেই থাক, আমার কাজ কর।"

এদিকে অস্‌ওয়াল্ড গিয়ে অভিযোগ করল গনেরিলের কাছে—"রাজার এক নাইট আমাকে লাথি মেরেছে।" গনেরিল এতক্ষণ অসুখের ভান করে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়নি। এইবার এই অজুহাত পেয়ে তিনি একটা মুখোমুখি বোঝাপড়া করবার জন্য লীয়ারের ঘরে এসে হানা দিলেন।

"এসব কী অত্যাচার, বাবা?"—তিনি অভিযোগ করলেন—"তোমার দুর্দান্ত নাইটগুলোর জন্যে আমার এক তিল শান্তি নেই। তারা হৈ-হল্লা করছে, মদ খাচ্ছে, নানা রকম অসভ্যতা করছে, আমার রাজপ্রাসাদ যেন হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সস্তাদামের হোটেল! এত অত্যাচার আমি সইতে পারব না।"

লীয়ার আকাশ থেকে পড়লেন—"আমার নাইটেরা হৈ-হল্লা করছে? তারা তো সব সুসভ্য বড় বড় বংশের সন্তান। তোমার এ অভিযোগ একেবারে বাজে।" লীয়ার উড়িয়ে দিতে চাইলেন গনেরিলের সব কথা।

কিন্তু গনেরিল মনস্থির করেই এসেছেন। তিনি স্পষ্ট বললেন—

"আমার প্রাসাদে একশো নাইটের স্থান হবে না বাবা! তুমি পঞ্চাশ-জন রেখে বাকী সব বিদায় করে দাও।"

এরকম কথা শোনার অভ্যাস নেই লীয়ারের। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—"অকৃতজ্ঞ! কী বন্দোবস্ত হয়েছিল রাজ্য ভাগ করে দেওয়ার সময়? একশো নাইট আমার সঙ্গে থাকবে, এই কথা কি প্রথম থেকেই ছিল না? তোরা দুই বোন কি প্রথমেই এতে রাজী হোস্‌নি? তোকে আর রিগানকে আমার রাজ্য ঐশ্বর্য ক্ষমতা সব কিছুই দান করে দিয়েছি, আমার বলতে রেখেছি কেবল ঐ একশোটি নাইট। তারাও তোর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল? গোটা রাজ্যটার বিনিময়ে তাদের সামান্য ব্যয়ও দুই বহন করতে ইচ্ছুক নোস্?"

রাজা যতই তিরস্কার করুন, গনেরিলের ঐ এক কথা। পঞ্চাশজন নাইটকে এখুনি বিদায় দিতে হবে। তাদের জায়গা গনেরিলের প্রাসাদে হবে না।

ক্রুদ্ধ লীয়ার তাকে অভিশাপ দিতে দিতে বেরিয়ে গেলেন তার প্রাসাদ থেকে। তিনি আর তার বাড়িতে থাকবেন না। আরও এক কন্যা আছে তার! সে কখনও এমন নিমকহারাম হবে না, সে কখনও পিতার অসম্মান করতে পারবে না। তিনি রিগানের বাড়িতে যাবেন—এই দণ্ডেই যাবেন। কেইয়াসবেশী কেন্টকেই তিনি রিগানের কাছে পাঠালেন, পত্র দিয়ে। পত্রে লিখলেন—"আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। এখনই যাত্রা করছি।"

কেন্ট রওনা হয়ে গেলেন।

ওদিকে গনেরিলও এক পত্র লিখলেন রিগানকে। এখানে পিতার সঙ্গে যে-কলহ হয়েছে, তা সবিস্তারে লিখে রিগানকে জানালেন যে তিনিও যেন বুড়োর আবদার না শোনেন। দুই জায়গায় একই ভাবে ঘা খেলে তিনি নিজের জেদ ছাড়তে বাধ্য হবেন।

কেন্ট উপস্থিত হলেন রিগানের প্রাসাদে! ঠিক সেই সময়ে

গনেরিলের চিঠি নিয়ে অস্‌ওয়াল্ডও পৌছুলো। দু'খানি পত্রই পড়লেন রিগান। পত্র পড়েই তিনি আর তাঁর স্বামী কর্নওয়াল গৃহ থেকে বেরিয়ে পড়লেন সমস্ত লোকজন সঙ্গে নিয়ে। রাজা যদি আসেন, এসে দেখবেন যে কেল্লার দরজা বন্ধ।

কেন্ট বললেন—"আমার পত্রের উত্তর দিয়ে গেলেন না তো!"

নীরস উত্তর এল—"আমরা গ্লস্টারের আর্ল-এর বাড়িতে যাচ্ছি, সেখানে এসো, সেইখানে গিয়ে উত্তর দেব।"

কেন্টকেও অগত্যা যেতে হল ওদের সঙ্গে। অস্‌ওয়াল্ডও গেল।

আর্ল অব গ্লস্টারের বাড়িতে সবাই উপস্থিত হলেন।

গ্লস্টার নিজেও বুড়ো, লীয়ারের প্রতি তাঁর রাজভক্তি এখনও অটুট।

সেইদিনই তাঁর গৃহে এক ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। পালিত পুত্র এডমণ্ডের মিথ্যা অভিযোগে নিজপুত্র এডগারকে তিনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। নানারকম ছল-চাতুরীর সাহায্যে পাপিষ্ঠ এডমণ্ড বুড়ো আর্লকে বুঝিয়েছিল যে পিতাকে হত্যা করে এডগার নিজে আর্ল হয়ে বসবার জন্য চেষ্টা করছে।

অভাগা এডগার! কোন দোষ সে করেনি। পিতাকে সে সত্যিই ভক্তি করে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। যখন সে শুনল যে সেই পিতাই তাকে দোষী মনে করে সৈন্য নিয়ে তাকে ধৃত করতে আসছেন, তখন সে পালাল। প্রাণভয়ে লুকিয়ে রইল মাঠে-জঙ্গলে পাগল সেজে! আর বৃদ্ধ আর্ল লোকজন নিয়ে সারা দেশ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, তাকে ধরে নিয়ে কয়েদখানায় পুরবার জন্য। এই ভীষণ গোলমালের মুখে রিগান আর কর্নওয়াল এসে গ্লস্টারের অতিথি হলেন। মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে বৃদ্ধ আর্ল তাঁদের আদর-আপ্যায়নে মন দিলেন। কারণ রিগান এখন রানী, আর কর্নওয়াল রাজা।

এই সময়ে বাইরে কেন্ট-এর সঙ্গে লড়াই বেঁধে গেল অস্‌ওয়াল্ডের।

গোলমাল শুনে কর্নওয়াল বেরিয়ে এলেন, এবং গনেরিলের ভৃত্য অস্‌ওয়াল্ড কেণ্টের হাতে মার খেয়েছে শুনে কেণ্টকে স্টক-এর ভিতর আটকে রাখবার আদেশ দিলেন। স্টক হল একরকম কাঠের পিপে, এর ভিতর হাঁটু অবধি বন্ধ করে অপরাধীকে ফেলে রাখা হয়। সে না পারে হাঁটতে না পারে বসতে। কেণ্ট যে রাজার দূত একথা বার বার শুনতে পেয়েও তিনি তাঁর আদেশ ফিরিয়ে নিলেন না। রাজার দূতের প্রতি কোন সম্মান দেখানো যে তাঁর কর্তব্যের ভিতরে, এ-কথা তিনি স্বীকারই করতে চাইলেন না।

এদিকে লীয়ার এসে পড়লেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে রিগান আর কর্নওয়াল প্রাসাদে প্রবেশ করে শয্যাগ্রহণ করলেন। রাজা এলে তাঁকে জানানো হল—তাঁর কন্যাজামাতা বড়ই অসুস্থ, এখন তাঁরা রাজার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না।

লীয়ার হতবাক্। এই কি রিগানের ভক্তি আর ভদ্রতা? এরই কাছে আদর-যত্ন পাওয়ার আশায় তিনি ছুটে এসেছেন, গনেরিলের উপর রাগ করে!

এর পর যখন তিনি দেখলেন যে তার দূত কেণ্টকে স্টক-এর ভিতর আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, তখন তিনি রেগে একেবারে আগুন হয়ে গেলেন। এ দণ্ড শুধু ছিচকে চোর-জুয়াচোরদেরই দেওয়া হয়ে থাকে। কেণ্টকে এভাবে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্য যে রাজাকেই অপমানিত করা—তা লীয়ারের বুঝতে বাকী রইল না।

রাজার বার বার ডাকাডাকিতে বাধ্য হয়ে রিগান আর কর্নওয়ালকে বাইরে আসতে হল, কেণ্টকেও করতে হল মুক্ত। কিন্তু একশো নাইটসহ রাজাকে নিজের বাড়িতে রাখার ক্ষমতা যে তার নেই, একথা রিগান স্পষ্টভাষায় তাঁকে জানিয়ে দিল।

"আপনি ছাড়া জীবনে আমার কোন আনন্দ নেই"—এই কথা বলে যে রাজ্যের ভাগ আদায় করেছিল, আজ তার মুখের ভাষা এইরকম—"এখন তো আমার কাছে তোমার আসবার কথা নয়।

এখন দিদির কাছে একমাস থাকবার কথা। একমাস পরে এসো। এখন আমি নিজের বাড়ি ছেড়ে এই প্লস্টারের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছি। এখন তোমার লোকজনকে খেতে দেব কোথা থেকে?"

চিঠি লিখে বোনকে উসকে দিয়েও গনেরিল ঠাণ্ডা হয়ে থাকতে পারেননি, দূতের পিছনে পিছনে নিজেও এসে হাজির হলেন এই সময়। ভগ্নীকে জানালেন—একশোর জায়গায় পঞ্চাশজন নাইট রাখবার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল বলেই রাজা তাঁর উপর ক্ষেপে গিয়েছেন! রিগান যদি পারে—একশোজন নাইট রাখুক, তিনি পারবেন না।

রিগান তার উত্তরে জানালেন—তিনি রাখতে পারবেন না পঞ্চাশজনও। তাঁর কাছে থাকতে হলে মাত্র পঁচিশটি নাইট নিয়ে রাজাকে থাকতে হবে।

রাজা তখন পাগলের মত। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"তবে চল, গনেরিল, তোমার কাছেই ফিরে যাই। তুমি তবু পঞ্চাশজনকে ঠাঁই দিতে চেয়েছো। এতে বোঝা যাচ্ছে তোমার ভালবাসা অন্ততঃ রিগানের ভালবাসার দ্বিগুণ। চল তোমার কাছেই যাই।"

গনেরিল সুযোগ পেয়ে গেলেন। বললেন—"ভগ্নী রিগানের প্রস্তাব শুনে আমারও এখন মনে হচ্ছে—পঞ্চাশজন অনুচরও তোমার পক্ষে বেশী। ঐ পঁচিশজনেই তোমার চলতে পারে। কিংবা, ভেবে দেখলে, ঐ পঁচিশজনেরও কোন দরকার দেখা যায় না। আমার নিজের চাকরেরা রয়েছে, তারা কি তোমারও সেবা করতে পারে না? না, করবে না? না যদি করে, আমি তাদের শাসন করব। রিগানের এখানেও সেই কথা। তোমার নিজের কতকগুলো লোকজন থাকবার আবশ্যক কি? তুমি সবগুলি নাইটকেই বিদায় দাও।"

তখন আকাশ কালো করে ঝড় আসছে।

লীয়ার একবার গনেরিলের, একবার রিগানের মুখের দিকে চাইছেন। এরা কি তাঁর কন্যা? না, নরকের কীট? মানুষ কখন

এমন অকৃতজ্ঞ হতে পারে? হতে পারে পিশাচের মত নিষ্ঠুর? না, এরা কখন তাঁর সন্তান নয়, মানুষের আকারে দানবী এরা।

ক্ষিপ্তের মত তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"আমি তোমাদের কারও কাছেই আশ্রয় চাই না! তোমাদের বাড়িতে বাস করার চাইতে এই ঝড়ের রাত্রে খোলা মাঠে পড়ে থাকাও শ্রেয়ঃ! তোমরা নরকে যাও, আমি তোমাদের মুখ আর দেখব না।"

পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেলেন লীয়ার। গ্লস্টার তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করছিলেন, এমন সময় কর্নওয়াল তাঁকে নিষেধ করলেন—"দরকার নেই। যেখানে খুশি যাক! বুদ্ধিশুদ্ধি যার লোপ পেয়েছে, তার উপযুক্ত স্থান ঐ প্রান্তরই। আপনি দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিন।"

এই বলে রিগানকে নিয়ে কর্নওয়াল ভিতরে চলে গেলেন।

* * * *

সে কী ভীষণ রাত্রি। ঝড়বৃষ্টি আর বজ্রপাতে পৃথিবী যেন ধ্বংস হয়ে যেতে চাইছে। মাটি কেঁপে উঠছে থরথর করে। কড়কড় রবে গর্জন করছে নিবিড় কালো মেঘমালা। তারই নীচে শুভ্র কেশ এলিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ লীয়ার দাঁড়িয়েছেন মুক্ত প্রান্তরে এসে—চীৎকার করে অভিশাপ দিচ্ছেন কন্যাদের উদ্দেশে। আকাশকে ডেকে বলছেন—"পৃথিবীটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে সমুদ্রে ফেলে দাও!" বর্ষা-বিদ্যুৎকে তিরস্কার করছেন—"কী আমি তোমাদের অনিষ্ট করেছি যে শয়তানী দুটো মেয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—এই বুড়োর মাথার উপর এত অত্যাচার তোমরা বর্ষণ করে চলেছ?"

কেণ্ট এসে তাঁর হাত ধরে একটা ভগ্ন কুটিরে নিয়ে গেলেন। সে কুটিরে বাস করে পাগলা টম।

এ পাগলা টম আর কেউ নয়, ছদ্মবেশী এডগার, গ্লস্টারের পলাতক পুত্র!

একটু পরেই বৃদ্ধ গ্লস্টার এলেন মশাল হাতে নিয়ে। কর্নওয়ালের

কঠোর নিষেধও তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি। একদিন এই লীয়ারেরই হুকুমে সারা দেশের লোক উঠত বসত, তা তিনি ভুলতে পারেননি। আজ সেই বৃদ্ধ রাজাকে এই দুর্যোগের রাত্রে খোলা মাঠে ফেলে রেখে তিনি কোন্ প্রাণে নিজে গৃহে বসে থাকবেন? রাজাকে কুটির থেকে বার করে নিয়ে নিকটবর্তী এক গোলাবাড়িতে তুললেন তিনি। নিয়ে এলেন আহার্য, নিয়ে এলেন শয্যা।

তাঁর এই রাজভক্তির ফল হল অতি ভয়ানক। তাঁর পালিত পুত্র—নরাধম এডমণ্ড—সব কথা গিয়ে বলে দিল কর্নওয়ালকে। আর কর্নওয়াল? রেগে আগুন হয়ে গেলেন একেবারে এ খবর শুনে। কী? এত বড় কথা? তাঁর হুকুম অমান্য করে বুড়ো গ্লস্টার? গ্লস্টার প্রাসাদে ফিরে আসতেই তাঁকে ধরে রাক্ষস কর্নওয়াল দুটি চক্ষু উপড়ে নিলেন।

কর্নওয়ালও পাপের সাজা পেলেন হাতে হাতে। গ্লস্টারের এক ভৃত্য তার প্রভুকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিল। তার সঙ্গে যুদ্ধ হল কর্নওয়ালের। সে নিজে মারা গেল বটে, কিন্তু তার অস্ত্রও একটা আঘাত করে গেল কর্নওয়ালের দেহে। সে আঘাত ক্রমে বিষিয়ে উঠল, তাইতেই নরকের কীট কর্নওয়ালকে ফিরে যেতে হল আবার নরকে!

রিগানের কি বড়ই দুঃখ হল স্বামীহারা হয়ে? তেমন পাত্রীই সে নয়। এডমণ্ডের কাছে সে প্রস্তাব করল—এডমণ্ড তাঁকে বিবাহ করুক। বুড়ো আর্লকে অন্ধ করে দেবার পর কর্নওয়াল ত এডমণ্ডকে গ্লস্টারের আর্ল উপাধি দিয়েই গিয়েছিল, এখন রিগান তাকে নিজের সেনাপতি এবং রাজ্যের শাসকপদে বহাল করল।

এদিকে কেণ্ট কিছু লোকজন সংগ্রহ করে লীয়ারকে ডোভারে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্র পার হয়ে এসে সেখানে অবতরণ করেছে ফ্রান্সের একটা সৈন্যদল। কর্ডেলিয়া এই সৈন্য নিয়ে নিরাশ্রয় পিতাকে ভগ্নীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে এসেছেন।

লীয়ার এখন বদ্ধ পাগল। কর্ডেলিয়াকে তিনি চিনতেই পারলেন না।

ফ্রান্সের সেনা এসেছে শুনে গনেরিলের স্বামী আলবানি এবং রিগানের ভাবী স্বামী এডমণ্ড একত্রে এসেছেন সেই আক্রমণ রুখবার জন্য। ধর্মের জয় এ পৃথিবীতে সব সময় হয় না।

গনেরিল রিগানেরই জয় হল যুদ্ধে। কর্ডেলিয়া এবং লীয়ার হলেন বন্দী। এতক্ষণে লীয়ার চিনতে পারলেন কর্ডেলিয়াকে। বললেন—"চল্ মা, খাঁচার পাখির মত দুজনে কারাগারে বসে গান গাই।"

কিন্তু গান গাইবার সুযোগ আর তাঁদের হল না। দুর্বৃত্ত এডমণ্ডের আদেশে কারাগারেই নিহত হলেন কর্ডেলিয়া। সেই মৃতদেহ কোলে করে হাহাকার করতে করতে প্রাণ বিসর্জন করলেন ভাগ্যহীন লীয়ারও। মরবার আগে তিনি বুঝে গেলেন তিন মেয়ের মধ্যে কোন্ মেয়ে তাঁকে সত্যি ভালবাসত।

আর, রিগান?—গনেরিল তাঁকে বিষ খাইয়ে মারলেন।

গনেরিল?—স্বামী আলবানির ভয়ে আত্মহত্যা করে মরলেন।

এডমণ্ড?—এডগারের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে মরল।

মৃত লীয়ারের জন্য শোক করতে বেঁচে রইলেন শুধু প্রভুভক্ত কেণ্ট! অন্ধ গ্লস্টারের শুশ্রূষা করবার জন্য বেঁচে রইল শুধু পিতৃভক্ত এডগার। আর ব্রিটেনকে শান্তিসুখ ফিরিয়ে দেবার জন্য রইলেন নতুন রাজা আলবানি,—গনেরিল রিগানের মহাপাপে যিনি কোনদিন সায় দেননি।

ওথেলো

মধ্যযুগে ভেনিস ছিল সমুদ্রের রানী। তার যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে এঁটে উঠবার সামর্থ্য কোন দেশেরই ছিল না। সেই নৌবহরের সঙ্গ ধরে ভেনিসের বণিকেরা দূর দূরান্তরে চলে যেত মালভরতি জাহাজ নিয়ে। সারা পৃথিবীর ধনরত্ন এনে মজুত করত ভেনিস নগরে।

ভূমধ্যসাগরের নানা দ্বীপ, এবং সমুদ্রতীরের নানা দেশও ভেনিসের শাসনের অধীনে এসে গিয়েছিল সেই যুগে! সাইপ্রাস এদের মধ্যে একটি। ভেনিস থেকে একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়ে আসতেন এই দ্বীপ শাসন করবার জন্য।

একবার তুর্কী দেশের নৌবাহিনী সেজেগুজে এল এই সাইপ্রাস দখল করবার জন্য।

সাইপ্রাসের রাজ্যপাল মন্‌ট্যানো ঝটতি ভেনিসে খবর পাঠালেন।

ভেনিসের শাসনকর্তার উপাধি 'ডোগ' বা ডিউক। শাসনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন সিনেট সভা। ভেনিসের সব গণ্যমান্য

লোকেরই আসন আছে এই সভায়। সাইপ্রাসে তুর্কীরা হানা দিয়েছে শুনে ডিউক এবং সিনেট সভা একবাক্যে বললেন—"এ বিপদে ওথেলো ছাড়া আমাদের গতি নেই। তাঁকেই ষোলআনা কর্তৃত্ব দিয়ে সাইপ্রাসে পাঠানো হোক।"

রাতদুপুরে সৈনিকরা ছুটল ওথেলোকে ডেকে আনবার জন্য।

ওথেলো ভেনিসের অধিবাসী নন। জাতিতে তিনি মুর। আফ্রিকার মরক্কো দেশের লোক। প্রথম যৌবনেই ভেনিসে এসে, সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করেন, তারপর বহু যুদ্ধে নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে ধাপে ধাপে তিনি উন্নতি লাভ করেছেন। আজ বিদেশী হয়েও তিনি ভেনিসের প্রধান সেনাপতি, বিপদের সময় ভেনিস সরকারের তিনি একমাত্র ভরসা।

* * *

রাজকীয় সৈন্যেরা যখন ওথেলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, সেই সময়েই আর একদল লোকও সন্ধান করছিল তাঁর। সিনেটের সভ্য ব্রাবান্‌সিওর লোক এরা। ব্রাবান্‌সিও নিজেও আছেন এ দলে।

কিন্তু ব্রাবান্‌সিও কেন ওথেলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এত রাতে? বিশেষ কারণ ঘটেছে একটা।

আজই রাত্রে একটু আগে রোডেরিগো নামে এক অভিজাত যুবক এবং আয়াগো নামে একজন সৈনিক এসে ব্রাবান্‌সিওর বাড়ির দরজায় করাঘাত করতে থাকে। ব্রাবান্‌সিও তো প্রথমে তাদের দস্যুই মনে করেছিলেন, এবং অস্ত্র নিয়ে তাদের উপর চড়াও হবার ভয়ও দেখিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর ভুল ভাঙল।

এরা দুজন এসেছে ব্রাবান্‌সিওর ভালোর জন্যই। তাঁকে খবর দিতে এসেছে যে তাঁর কন্যা দেস্‌দিমোনা সেই রাত্রেই গৃহ ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন এবং শহরের কোন এক জায়গায় সেনাপতি ওথেলোর সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে গোপনে বিবাহ করেছেন।

ব্রাবান্‌সিও তো একথা বিশ্বাস করতেই চাননি প্রথমে। তারপর সংবাদ নিয়ে যখন দেখলেন যে দেস্‌দিমোনা সত্যিই গৃহে নেই, তখন আর বিশ্বাস না করে উপায় কি ?

তিনি ভেবেও দেখলেন—কথাটা মিথ্যা না হতে পারে। ওথেলো ইদানীং প্রায়ই তাঁর গৃহে আসতেন। তাঁর মত মানী গুণী লোক তাঁর বাড়িতে আসছেন—এতে ব্রাবান্‌সিও নিজেও গৌরব বোধ করতেন। তার উপর দেস্‌দিমোনার নিজের তো ওথেলোর উপর সুনজর ছিলই। তাঁকে পেলেই মধুর হাসি হেসে নিজের বসবার ঘরে ডেকে নিয়ে যেত এবং তাঁর মুখ থেকে তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী শুনবার জন্য বিষম আগ্রহ প্রকাশ করত। বালিকাদের এরকম গল্প শোনার ঝোঁক হয়—এই মনে করে ব্রাবান্‌সিও এতে দোষের কিছু দেখতে পাননি।

এখন তিনি বুঝতে পারলেন—নিরিবিলিতে গল্প-বলার সুযোগ পেয়ে পেয়ে ওথেলো দেস্‌দিমোনার হৃদয় অধিকার করেছে একটু একটু করে! তারই ফলে আজ রাত্রে এই গোপন বিবাহ।

কিন্তু এ বিবাহে ব্রাবান্‌সিওর মত নেই। তিনি একে বিবাহ বলেই মানবেন না। ওথেলো তাঁর নিজের দেশের বা নিজের ধর্মের লোক নন; তার উপর দেস্‌দিমোনার তুলনায় তাঁর বয়সও বেশী। নাঃ, তিনি এ বিবাহকে স্বীকার করে নেবেন না কোন-মতেই। ওথেলোর হাত থেকে কন্যাকে উদ্ধার করে আনবার জন্য তিনি দলবল সাজিয়ে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়লেন নগরীর রাজপথে।

প্রায় একই সময়ে দুটি দলই খুঁজে বার করল ওথেলোকে। একদল জানাল ডিউকের আহ্বানের কথা, আর একদল আনল অভিযোগ। ব্রাবান্‌সিও দাবি করলেন এখনই ওথেলোকে আদালতে হাজির করা হবে—তাঁর কন্যাকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার অপরাধে।

"ডিউকের কাছে গেলেই ব্রাবান্‌সিওর অভিযোগের বিচারও

হতে পারবে। ওথেলোর মত একজন মানী লোককে নিয়ে গোলমাল, বহু লোক জমে গেল রাস্তায়। তারা সবাই বলল—রাজ-পথে বাগ্‌বিতণ্ডা না বাড়িয়ে ওথেলোকে নিয়ে যাওয়া হোক রাজ-দরবারে।"

ডিউকের প্রাসাদে তখন সবাই নানা কাজে ব্যস্ত। গভীর নিশীথেও কেউ নিদ্রা বা বিশ্রামের কথা চিন্তা করতে পারছেন না। স্বয়ং ডিউক সিনেটের সভ্যদের নিয়ে ওথেলোর অপেক্ষায় রয়েছেন। কারণ ওথেলো ভিন্ন অন্য কেউ যে তুর্কী আক্রমণ থেকে সাইপ্রাস রক্ষা করতে পারবে না, তা সবাই জানেন।

অবশেষে ওথেলো এলেন, সঙ্গে এলেন ব্রাবান্‌সিও তাঁর নালিশ নিয়ে।

ব্রাবান্‌সিও নিজেও সিনেটের সদস্য; নগরীর শাসক-সমাজের ভিতর তিনিও একজন। কাজেই তাঁর অভিযোগ একটা গুরুতর জিনিস ভেনিসে। সে-অভিযোগের বিচার না করে অন্য কাজে মন দেওয়া ডিউকের পক্ষেও সম্ভব নয়।

ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ব্রাবান্‌সিও তাঁর অভিযোগের কথা ডিউককে আর সিনেট সভাকে শোনালেন। দেস্‌দিমোনাকে জাদুমন্তরে মোহিত করেছেন ওথেলো, সরলা বালিকাকে কথার কৌশলে ফাঁদে ফেলে অবশেষে বিবাহ করেছেন গোপনে। অতি সাংঘাতিক অপরাধ, এ-অপরাধের বিচার আগে হোক!

সবাই অবাক্। জাদুর শক্তিতে বিশ্বাস করত সে-যুগের লোক। অনেকেরই ধারণা হল—ব্রাবান্‌সিও সত্য কথাই বলেছেন। দেস্‌দিমোনা হলেন অপরূপ সুন্দরী, ভেনিসে এমন যুবক নাই যে তাকে পেতে না চায়। সেই রূপসী মেয়ে একটা কুশ্রী কালো মুরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করবে, এটা অনেকের কাছেই বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে হল। নিশ্চয়ই ওথেলো ইন্দ্রজাল চালিয়েছেন দেস্‌দি-মোনার উপরে।

ডিউক জিজ্ঞাসা করলেন—ওথেলোর বলবার কী আছে।

নানাজনের নানা কথা; তবু ওথেলো অটল। তিনি ধীরভাবে বললেন—তাঁর বীরত্বের কাহিনী শুনেই দেস্‌দিমোনা যেচে তাঁকে বিবাহ করেছেন। একথা সত্য কি মিথ্যা, তা দেস্‌দিমোনাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেই ত জানতে পারা যাবে!

একথা ত ঠিক। ডিউক বললেন—দেস্‌দিমোনার সাক্ষ্য অবশ্যই নিতে হবে। তাঁর কী বলবার আছে, তা না শুনে এ ব্যাপারের সত্যমিথ্যা বুঝবার কোন উপায় নেই। ডিউক দেস্‌দিমোনাকে ডেকে আনবার জন্য লোক পাঠালেন।

ততক্ষণ ওথেলো নিজে এ-সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি? সিনেট-সদস্যগণ দেস্‌দিমোনার কথা শুনবার আগে ওথেলোর দিকের কথাটা শুনতে চান।

ওথেলোর গোপন করবার কিছু নাই। কারণ দেস্‌দিমোনার ভালবাসা পাওয়ার জন্য কোন নীচতার সাহায্য তিনি কোনদিন গ্রহণ করেননি। আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তিনি বলতে পারেন—দেস্‌দিমোনা তাঁকে যাতে ভালবাসে, এমন কোন চেষ্টাও জেনে-শুনে তিনি কোনদিন করেননি। মনে মনে তাঁর যত অনুরাগই থাকুক, ভাষায় তিনি তা দেস্‌দিমোনার সমুখে প্রকাশ করবার সাহস বহুদিন পর্যন্ত পাননি; পেয়েছিলেন অনেক পরে, যখন দেস্‌দিমোনা আকারে ইঙ্গিতে নিজেই তাঁকে বুঝতে দিয়েছিলেন যে ওথেলো তাঁর কাছে হেলাফেলার পাত্র নন।

এই কথাগুলিই ওথেলো বলে চললেন সিনেট-সদস্যদের সম্মুখে।

"দেস্‌দিমোনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকেই তিনি আমার জীবনের কাহিনী শুনবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করতে থাকেন। সে কৌতূহলের কারণ ছিল। তাঁর পরিচিত অন্য পুরুষদের থেকে আমি অনেকটা অন্য রকম। আমার জাতি আলাদা, ধর্ম আলাদা, গায়ের রং, মুখের আকৃতি পর্যন্ত অন্য রকম। সংসারের কোন

ব্যাপারে কিছুই জানেন না কুমারী, এই পার্থক্য দেখেই আমার আগেকার কথা শুনবার জন্য তাঁর এত আগ্রহ হয়েছিল।

"তাঁরই আগ্রহে আমি তাঁকে আমার সমস্ত কথা বলতে শুরু করি। বাল্যেই নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসি, কারও কাছ থেকে কিছুমাত্র সাহায্য না পেয়েও শুধুমাত্র নিজের চেষ্টায় এই নিষ্ঠুর সংসারে নিজের দাঁড়াবার একটু জায়গা করে নিই। তারপর সবল হস্তে বাধাবিঘ্ন ঠেলে নির্ভয়ে এগিয়ে যাই সাফল্যের পানে।—এইসব কথা তাঁকে বলে যাই দিনের পর দিন।

"জীবনটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে মৃত্যুসাগর কতবার সাঁতরে পার হয়েছি—হৃদয়ের আবেগ দিয়ে তা বর্ণনা করতে করতে চমকে উঠে এক সময়ে তাকিয়ে দেখেছি যে কুমারীর আয়ত নয়ন করুণায় ছলছল করে উঠেছে। মমতায় কোমল হয়ে এসেছে সে চোখের দৃষ্টি। যে-আকর্ষণ গোড়ায় ছিল বীরত্বের প্রতি, তা ক্রমে বীরের উপর এসে পড়েছে, ধন্য হয়ে গিয়েছে এই কৃষ্ণকায় মুর। এইভাবেই আমি জয় করেছি আধফোটা কুসুমের মত নির্মল কুমারীহৃদয়। কৌশল বলুন, ইন্দ্রজাল বলুন—এ ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্য আমি নিইনি।"

এই সময়ে ডিউকপ্রেরিত দূতের সঙ্গে দেস্‌দিমোনাও এসে পড়লেন। তিনিও অক্ষরে অক্ষরে ওথেলোর কথায় সায় দিলেন। বেশির ভাগ একথাও তিনি বললেন—"এ বিবাহের প্রস্তাবও আসলে আমার কাছ থেকেই এসেছিল। কারণ আমি ওথেলোকে বলেছিলাম—'আপনার বন্ধুদের ভিতর এমন যদি কেউ থাকেন যিনি আমাকে ভালবাসেন, তাহলে তাঁকে পরামর্শ দেবেন আমার কাছে এসে আপনার বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করতে। তাহলেই তিনি আমার ভালবাসা পাবেন।' এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আমার দিক থেকে না পেলে ওথেলো হয়তো সাহস করে কোনদিনই আমাকে বিবাহ করবার কথা তুলতেই পারতেন না।"

ডিউক ও সিনেট-সদস্যেরা এইবার একবাক্যে বললেন যে, এই বিবাহের ব্যাপারে ওথেলোকে কোনমতেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যায় না। সব শুনে ব্রাবান্‌সিও নিজেও স্বীকার করলেন যে অপরাধ যদি কারও হয়ে থাকে, তবে সে তাঁর নিজের কন্যারই হয়েছে। ওথেলোকে তিনি তিক্তস্বরে উপদেশ দিলেন—"দেস্‌দিমোনাকে পেয়েছ, কিন্তু পেয়েই যেন নিশ্চিন্ত থেকো না। সে বিশ্বাসের যোগ্যা নয়। পিতাকে ঠকিয়েছে, পতিকেও ঠকাতে পারে।"

রাগের মুখে মানুষ অনেক কিছুই বলে। বলা বাহুল্য একথায় ওথেলো বা অন্য কেউ কর্ণপাত করলেন না।

এ-ব্যাপারের একরকম মীমাংসা করে ডিউক তখন ওথেলোকে খুলে বললেন—সাইপ্রাস দ্বীপের উপর তুর্কী আক্রমণের কথা। সাইপ্রাস রক্ষার জন্য ওথেলোকেই যে যেতে হবে, তাও প্রকাশ করলেন। ওথেলোর তাতে আপত্তি নেই। কারণ বীর যে, সে তো সদাই কামনা করে এই ধরনের কাজ। নিত্য নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে পেলেই তার আনন্দ।

ডিউক তখন ওথেলোকে সাইপ্রাসের রাজ্যপাল ও সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। ওথেলো বললেন—তিনি দেস্‌দিমোনাকে ভেনিসে কোথাও রেখে যেতে চান। কিন্তু দেস্‌দিমোনা রাজী হলেন না সে-প্রস্তাবে। তাঁকে স্বামীর সঙ্গে যেতেই হবে। ওথেলো যখন সাইপ্রাসে যাচ্ছেন, দেস্‌দিমোনাই বা যাবেন না কেন?

ওথেলো তখন নিজের অধীনস্থ সৈনিক আয়াগোর উপর ভার দিলেন দেস্‌দিমোনাকে সাইপ্রাসে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আর নিজে তক্ষুনি সাইপ্রাসের দিকে জাহাজ খুলে দিলেন, তুর্কী নৌ-বাহিনীর গতিরোধ করবার জন্য।

* * *

এই আয়াগোর একটু ইতিহাস আছে। সৈনিক হিসাবে তার

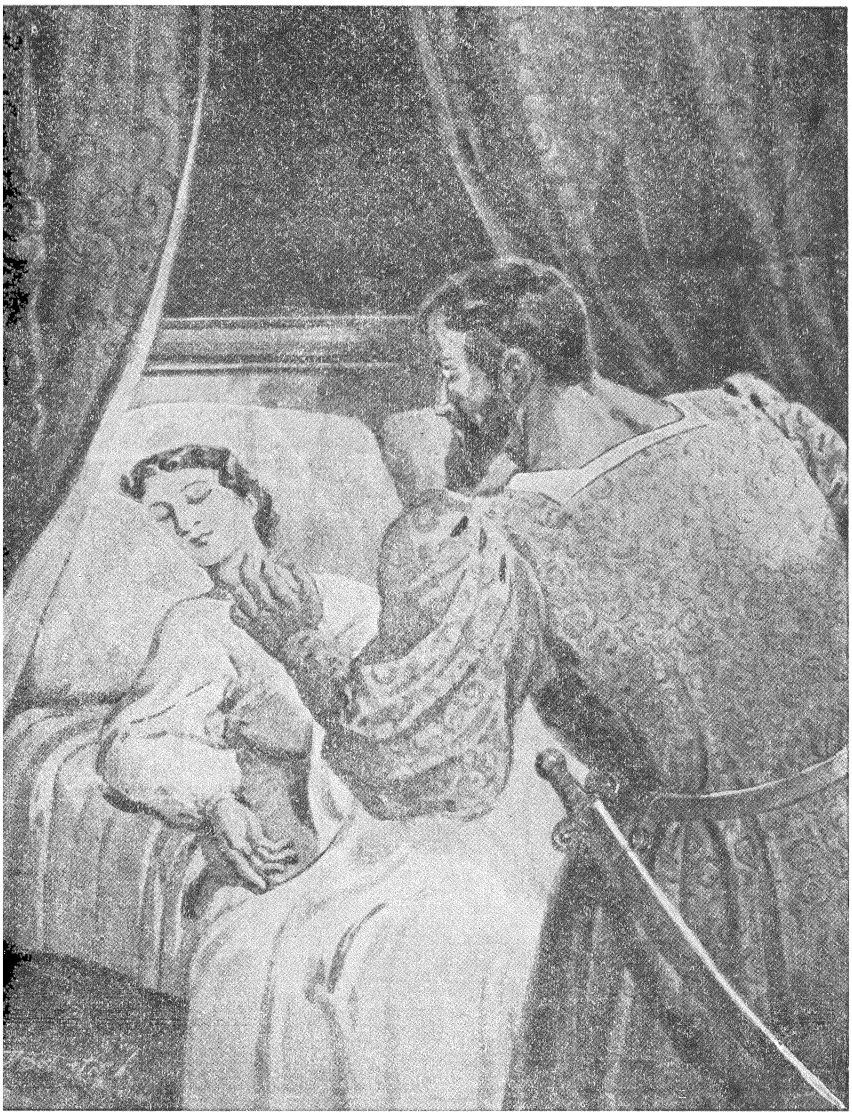

পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলেন ওথেলো ঘুমন্ত দেস্‌দিমোনার কাছে

দক্ষতা থাকলেও মানুষ হিসাবে সে অসাধু। ওথেলো যখন প্রথম নিযুক্ত হন ভেনিসের সেনাপতিপদে, তখন আয়াগো অনেক চেষ্টা করেছিল তাঁর সহকারীর পদ পাওয়ার জন্য। কিন্তু সহকারীপদে কেসিওকে বেছে নিয়েছিলেন ওথেলো, আয়াগোকে দিয়েছিলেন নীচের একটি ছোট পদ। সেই থেকে ওথেলোর উপর একটা ভয়ানক রাগ রয়েছে তার, বহু বৎসর কেটে গেলেও সে রাগ একটুও কমেনি। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে সে ওথেলোর অনুগত সেবকমাত্র, সেনাপতির আদেশ পালন ছাড়া তার অন্য কাজ নেই। কিন্তু মনে মনে সে ওথেলোর ভয়ানক শত্রু। সুযোগ পেলে তাঁর সর্বনাশ করতেও সে পিছপা হবে না। ওথেলো যে রাত্রে দেস্‌দিমোনাকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে আহ্বান করে নিয়ে গিয়ে গোপনে বিবাহ করেন, সে রাত্রে আয়াগো সে ব্যাপার জানত, কারণ ব্যাপারটাতে ওথেলো ওর কিছু সাহায্য নিতেই বাধ্য হয়েছিলেন। সাহায্য করতে এসে সে বিবাহের ঘটনাটা জেনে ফেলে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে ছুটে যায় ব্রাবান্‌সিওকে খবর দেবার জন্য। ওর আশা ছিল এই যে ক্রুদ্ধ ব্রাবান্‌সিওর অভিযোগে ওথেলোকে শাস্তি দেবেন ডিউক ও সিনেট-সদস্যেরা। কারণ ব্রাবান্‌সিওর মান-মর্যাদা বজায় রাখতে হলে সে-শাস্তি দিতেই হয়।

আয়াগোর সঙ্গী ছিল ভেনিসের এক ধনী যুবক রোডেরিগো। এই যুবকটির স্বভাব অতি মন্দ। বাবুগিরিতে আর বদখেয়ালে অঢেল পয়সা খরচ করে। সে বহুদিন থেকে দেস্‌দিমোনার অনুরাগী। কিন্তু দেস্‌দিমোনা কোনদিন তার কথায় কান দেননি, তবু আশা ছাড়েনি রোডেরিগো। ভেবেছিল, ধৈর্য ধরে থাকলে একদিন সে দেস্‌দিমোনার ভালবাসা লাভ করবেই। কিন্তু এখন ওথেলোর সঙ্গে দেস্‌দিমোনার বিবাহ হয়ে যেতেই তার সব আশায় ছাই পড়ল!

আয়াগো দেখল এই একটা সুযোগ। সে রোডেরিগোকে আশ্বাস দিল। বলল—ওথেলোর প্রতি দেস্‌দিমোনার এই অনুরাগ—এ একটা খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। প্রেম হয় সমানে সমানে। ওথেলোর সঙ্গে দেস্‌দিমোনার মিল নেই কোন দিক্ দিয়েই। একজন কালো জাতের লোক, অন্যজন সাদা। লেখাপড়া ভাবনা-ধারণা এমন-কি বয়স পর্যন্ত দুজনের এক নয়। এ-মিলন কখনও বেশী দিন টিকবে না। ছাড়াছাড়ি হবেই দুজনে। তখন রোডেরিগোর আশা পূর্ণ হবে। এখন একটি মাত্র কাজ করা দরকার। রোডেরিগোর লেগে থাকার দরকার দেস্‌দিমোনার পিছনে। কাছাকাছি থাকতে হবে; সর্বদা চোখে পড়তে হবে, সুযোগ পেলেই আকারে-ইশারায় অনুরাগ জানাতে হবে।

তাই, দেস্‌দিমোনার কাছে কাছে থাকবার জন্য রোডেরিগোরও সাইপ্রাসে যাওয়া প্রয়োজন—এইটেই আয়াগো তাকে বুঝিয়ে দিল। আর পরামর্শ দিল—"টাকা যোগাড় কর। কখন কিসে কী প্রয়োজন হয় বিদেশে-বিভুঁয়ে, টাকা যত পার সঙ্গে নাও। নারীর মন পেতে হলে সবচেয়ে বেশী কাজে আসে অর্থ। অতএব টাকায় পকেট ভরে নাও। বিষয় সম্পত্তি বাড়ি-গাড়ি যা কিছু আছে সবকিছু বেচে দিয়ে নগদ টাকা যোগাড় কর, তারপর পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চল সাইপ্রাসে। টাকা যার আছে, তাকে আটকাবে কে?"

এই পরামর্শমত রোডেরিগো প্রচুর অর্থ পকেটে নিয়ে আয়াগোর সঙ্গে চলল।

* * * *

দারুণ ঝটিকায় সাগর উথালপাথাল। তারই ভিতর দুটো নৌবাহিনী প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আগে আগে তুর্কী জাহাজের বহর, তারা সাইপ্রাসে গিয়ে নামতে চায়। পিছনে আসছে ওথেলোর নৌসৈন্য, তারা চায় তুর্কীদের সমুদ্রের ভিতরেই ডুবিয়ে দিতে। ওথেলোর উপর ভাগ্যদেবীর দয়া রয়েছে, বিনাযুদ্ধেই

শত্রুনাশ হল। ঝড়ের দাপটে তুর্কীদের সমস্ত জাহাজ মারা পড়ল। কতক ভেঙে গুঁড়িয়ে জলে ডুবে গেল, কতক পাল ছিঁড়ে হাল-দাঁড় ভেঙে অসহায়ভাবে সাগরতরঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল এক একটা এক এক জায়গায়।

সে তুলনায় ওথেলোর জাহাজগুলির ক্ষতি হয়েছে সামান্যই। তিনি নিরাপদে সসৈন্যে সাইপ্রাসে পৌঁছোলেন। আয়াগোর সঙ্গে দেস্‌দিমোনা তাঁর পূর্বেই সেখানে এসে পড়েছেন।

আগেকার রাজ্যপাল মন্‌ট্যানো খুব খাতির করে অভ্যর্থনা করলেন ওথেলোকে। ওথেলো সপরিবারে দুর্গে গিয়ে উঠলেন। সারা দ্বীপে উৎসব আরম্ভ হল; তুর্কী আক্রমণের ভয় দূর হয়েছে।

উৎসব করতে গিয়ে দ্বীপবাসীরা প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করছে দেখে ওথেলো তাঁর সুযোগ্য সহকারী কেসিওকে ডেকে আদেশ করলেন—"সারা রাত সাবধানে শান্তিরক্ষা করবে শহরের। তোমার উপরই সব-কিছু দেখাশোনার ভার দিয়ে আমি বিশ্রাম করতে যাচ্ছি। নেশার ঘোরে শহরবাসীরা যাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা না করে, কোথাও একটুও অশান্তি বা গোলমাল ঘটতে না পারে, তার দিকে তোমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা চাই।"

কেসিও সুযোগ্য ব্যক্তি; ওথেলোর খুবই বাধ্য। সেনাপতি তাঁর উপরে শান্তিরক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়াতে খুশী হয়েই তিনি শহরে টহল দেবার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। ওথেলো গেলেন বিশ্রাম করতে।

ধূর্ত আয়াগো ফাঁদ পাততে শুরু করল এইবার।

কেসিও সরল মিশুক লোক, সদাই হাসিখুশি, সকলের সঙ্গেই তাঁর অমায়িক ব্যবহার। আয়াগোকে তিনি বিশ্বাস করেন, একসাথে কাজ করতে হয় বলে বন্ধুর মতই দেখেন তাকে। তারই সুযোগ নিয়ে আয়াগো বলল—"আসুন সহকারী সেনাপতি, আনন্দের দিনে আমরাও দুই-একপাত্র সুরা সেবন করি।"

দুই-একপাত্রে কেসিওর আপত্তি নেই, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার লক্ষণ দেখা দিতেই তিনি ঘোরতর অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগলেন। এদিকে আয়াগো কিছুতেই ছাড়ে না, নানা উপরোধে কেসিওকে এত মদ খাওয়াল যে তাঁর আর মাথার ঠিক রইল না মোটেই!

সেই অবস্থায় তাঁকে যেতে হল প্রহরীদের কাজ দেখবার জন্য।

আয়াগো এইবার পড়ল রোডেরিগোকে নিয়ে। তাকে বোঝাল —"তুমি এইবারে গিয়ে কোন অছিলায় কেসিওর সঙ্গে ঝগড়া শুরু কর। কেসিও যাতে রেগে ওঠে, অস্ত্র নিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে তাই করতে হবে তোমায়। একটু আধটু আঘাতও যদি পেতে হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। তোমার-আমার মনের ইচ্ছা যদি পূর্ণ করতেই হয়, জেনো এইভাবেই কাজ করতে হবে আমাদের!"

আয়াগোর উপর অগাধ বিশ্বাস রোডেরিগোর। সে কেসিওর সন্ধানে গেল।

অল্প পরেই বাইরে শোনা গেল চেঁচামেচি, রাগারাগি আর চীৎকার। তার পরই যুদ্ধ করতে করতে কেসিও আর রোডেরিগোর প্রবেশ। রোডেরিগো আহত হয়েছে। কেসিও তবু তাকে ছাড়েননি।

রোডেরিগোকে রক্ষা করবার জন্য ছুটে এলেন মন্‌ট্যানো, আগে যিনি সাইপ্রাসের শাসনকর্তা ছিলেন।

কেসিও তখন রীতিমত মাতাল, সংযমের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলেছেন একেবারে। তিনি রোডেরিগোকে ছেড়ে মন্‌ট্যানোকে আক্রমণ করলেন। মন্‌ট্যানোও আহত হলেন।

ইতিমধ্যে সারা শহরে চীৎকার শুরু হয়েছে। কেসিওর পাগলের মত আচরণ দেখে ভয় পেয়ে শহরের সব নরনারী ছুটোছুটি শুরু করেছে চারিদিকে। সময় বুঝে ধূর্ত আয়াগো পাগলাঘন্টি বাজিয়ে দিল। যেন একটা ঘোরতর বিপৎপাত হয়েছে সাইপ্রাসে।

সেই ঘণ্টার আওয়াজে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গিয়ে ওথেলো শয্যা

থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। এসে যে দৃশ্য দেখলেন, তা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি কোনদিন! মন্‌ট্যানো আহত, রোডেরিগো আহত, সৈনিকেরা ভীত চকিত।

খোঁজখবর নিতে এটাই প্রকাশ পেল যে কেসিও হঠাৎ অকারণে এদের উপর চড়াও হয়ে ঐ দুটি ভদ্রলোককে এভাবে জখম করেছেন।

কেসিও? তার পক্ষে যে এরকম কাণ্ড করা সম্ভব, এ বিশ্বাসই করতে পারেন না ওথেলো। তিনি আয়াগোকে জিজ্ঞাসা করলেন। আয়াগো এমনই ভাবটা দেখাল যেন সত্য কথাটা চেপে যেতে পারলেই সে খুশী হয়, যা সে বলছে, তা ওথেলোর চাপে পড়েই বলছে। যেন অতি অনিচ্ছাতেই সত্য কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হল। এমন ভাবে সাজিয়ে সে গল্পটা শোনাল যাতে ওথেলোর মনে এই ধারণাই জন্মায় যে কেসিওই মাতলামি করে নগরে হল্লার সৃষ্টি করেছেন ও দুই-দুইজন ভদ্রলোককে অকারণে আক্রমণ করে ঘায়েল করেছেন।

আয়াগোই যে কেসিওকে মাতাল করেছিল, বা রোডেরিগো যে নিজে খুঁচিয়ে কেসিওর সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছিল, সে সব কথা আয়াগো একদম গোপন করে গেল।

যা শুনলেন—তাতে ওথেলো দারুণ ক্রুদ্ধ হলেন কেসিওর উপরে। সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে কেসিও সবচেয়ে দায়িত্বহীনের মত কাজ করেছেন। সহকারী সেনাপতির পদে থাকবার একান্তই অযোগ্য বলে নিজেকে প্রমাণ করেছেন কেসিও। ওথেলো সেই মুহূর্তেই কেসিওকে কর্মচ্যুত করলেন।

আয়াগোর প্রথম চাল সফল হল।

কেসিওর শূন্য পদে আয়াগোকেই নিয়োগ করলেন ওথেলো।

* * * *

কেসিওর হৃদয়টা ভেঙে গেল একেবারে। কিসে কি হয়ে গেল!

চিরদিন তিনি সংযমী পুরুষ, হঠাৎ একদিন নেশা করে নিজের একি সর্বনাশ করে বসলেন? জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল! যার সুনাম নষ্ট হয়েছে, তার জীবনের আর মূল্য কি!

কেসিও সরল মানুষ। নিজেকেই ষোল-আনা অপরাধী করলেন এ-ব্যাপারে। তাঁর ইচ্ছা না থাকলেও আয়াগো যে একরকম জোর করেই তাঁকে ক্রমাগত সুরাপান করিয়েছিল, তাঁর বেসামাল হবার একমাত্র কারণই যে আয়াগো, একথা মনেই হল না কেসিওর।

ঠিক এই সময়ে আয়াগোই এগিয়ে এল তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য। সহানুভূতির অনেক মিষ্টি কথা বলে তারপর পরামর্শ দিল—"সহকারী সেনাপতি! আপনি রাজ্যপালপত্নী দেস্‌দিমোনাকে ধরুন। আপনার জন্য তিনি একটি কথা যদি বলে দেন, ওথেলো আপনাকে এবারটা ক্ষমা অবশ্যই করবেন! আবার নিযুক্ত করবেন নিজ পদে।"

এ-পরামর্শ খুবই ভাল বলে মনে হল কেসিওর। সত্যই তো! দেস্‌দিমোনার কথা ওথেলো ঠেলতে পারবেন না। আর দেস্‌দিমোনাও নিশ্চয়ই কেসিওর পক্ষে দু'কথা বলবেন। কেসিওকে তিনি তো ভাল রকমই জানেন! বহুদিন থেকেই জানেন! ওথেলো যখন বিবাহের পূর্বে দেস্‌দিমোনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, কেসিও প্রায়ই থাকতেন তাঁর সঙ্গে। ওথেলোর কাছ থেকে অনেক খবরাখবর কেসিওই বয়ে নিয়ে গিয়েছেন দেস্‌দিমোনার কাছে। কাজেই দেস্‌দিমোনাই এ বিপদে কেসিওর উত্তম আশ্রয়!

কেসিও দেস্‌দিমোনাকে গিয়ে ধরলেন। "আমায় বাঁচান এ বিপদে।"

দেস্‌দিমোনা তখনই স্বীকার করলেন—"আমি আপনাকে উদ্ধার করবই এ বিপদে। স্বামীকে আজই বলব আপনার কথা।"

এদিকে কেসিওকে দেস্‌দিমোনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েই আয়াগো চলে এসেছে ওথেলোর কাছে। কথা বলতে বলতে কৌশলে

ওথেলোকে নিয়ে এসেছে সেই দিক্‌টাতে, যেখানে কথা কইছেন কেসিও আর দেস্‌দিমোনা! ওঁদের দু'জনাকে দূর থেকেই এক জায়গায় দেখে সে যেন আপন মনেই বলে উঠল—"এ কী? এ তো ভাল কথা নয়!"

ওথেলো শুনতে পেলেন। আয়াগোকে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলছ? কী ভাল কথা নয়?"

আয়াগো আর সে কথার জবাব দিল না, বলল—"ও আমি নিজের মনে একটা কথা ভাবছিলাম!" কিন্তু এ জবাব ওথেলোকে খুশী করতে পারল না। তাঁর মনে হল—কী একটা কথা আয়াগো ভাবছিল, তাঁর কাছ থেকে বুঝি তা গোপন করে গেল।

দেখা হওয়া মাত্রই দেস্‌দিমোনা অনুরোধ করলেন ওথেলোকে —কেসিওকে ক্ষমা করতে হবে, আবার নিয়োগ করতে হবে তার নিজের পদে।

ওথেলোও রাজী হয়ে গেলেন। একে দেস্‌দিমোনাকে অদেয় তাঁর কিছুই নেই, তার উপর তিনি নিজেও কেসিওকে খুবই ভালবাসেন। কর্তব্যের খাতিরে, ন্যায়ের অনুরোধে কেসিওকে তিনি দণ্ড দিয়েছেন। এখন ক্ষমা করায় ক্ষতি নেই। এর পর থেকে কেসিও নিশ্চয় সাবধান হয়ে চলবেন।

তিনি বললেন—কেসিওকে তিনি ক্ষমা করবেন।

* * * *

আয়াগোর পত্নী এমিলিয়া! সে দেস্‌দিমোনার সহচরী হয়ে সাইপ্রাসে এসেছে। দেস্‌দিমোনাকে সে ভালবাসে।

কিন্তু আয়াগোর কথার অবাধ্য হতে পারে না এমিলিয়া।

বিবাহের আগে ওথেলো একখানি রুমাল উপহার দিয়েছিলেন দেস্‌দিমোনাকে। নানা আশ্চর্য সেলাইয়ের কাজ থাকার দরুন রুমালখানি ভারি সুন্দর। ওথেলোর পিতা ওখানি পেয়েছিলেন মিশরের এক বেদেনীর কাছে। ওর নাকি কী সব জাদুশক্তি আছে।

ওথেলোর পিতা ওখানি ওথেলোর মাতাকে দিয়ে বলেছিলেন—"এই রুমাল যতদিন তোমার কাছে থাকবে, ততদিন তোমার আমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকবে।"

ওথেলোর মা মৃত্যুকালে রুমালখানি ওথেলোকে দিয়ে যান। বলে যান—"বিবাহের পর এটি তোমার স্ত্রীকে দিও। সে যেন কখনো এটি না হারায়।"

ওথেলো দিয়েছিলেন দেস্‌দিমোনাকে। বলেও দিয়েছিলেন সাবধানে রাখতে।

মানুষের ঘরের কথা জেনে বেড়ানো দুষ্ট লোকদের একটা কাজ। আয়াগো জানত এ রুমালের কথা। সে এমিলিয়াকে জপাতে লাগল—"রুমালখানি চুরি করে আমায় এনে দাও।"

আয়াগোর চরিত্র এমিলিয়ার অজানা নয়। তার অবাধ্য হলে সে যে দারুণ অত্যাচার করবে, তা এমিলিয়া জানে। তাই ভয়ে ভয়ে একদিন সে রুমালখানি চুরি করে এনে আয়াগোকে দিল। রুমাল পেয়ে আয়াগো তখনই তা রেখে এল কেসিওর ঘরে।

কেসিও নিজের ঘরে রুমালখানি দেখতে পেয়ে বিবেচনা করল —কোন বন্ধু বেড়াতে এসে ওটা তার ঘরে ভুলক্রমে ফেলে গিয়েছে। অবশ্যই বন্ধু একদিন ওটা ফেরত নিতে আসবে। ফেরত দেওয়ার আগে ঠিক ঐরকম একখানি রুমাল যদি কাউকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়, বেশ হয়। ওর সেলাইয়ের নকশাটি কেসিওর বড় পছন্দ হয়েছে। এদেশে ওরকম নকশার রুমাল কেসিও আর দেখেনি।

বিয়াঙ্কা নামে এক তরুণীর সাথে কেসিওর পরিচয় হয়েছে সাইপ্রাসে এসে। কেসিও তাকেই দিল রুমালখানি। বললে—"আমাকে এই নকশায় একখানা রুমাল করে দাও।" বিয়াঙ্কা রাজী হয়ে রুমাল নিজের ঘরে নিয়ে এল।

আয়াগো এইবার দিল তার দ্বিতীয় চাল।

কথায় কথায় একদিন ওথেলোকে বলল—"আপনার স্ত্রীর হাতে

একখানি রুমাল আমি অনেক সময় দেখেছি—অতি আশ্চর্য সেলাইয়ের কাজ তাতে।"

ওথেলো বললেন—"ও-রুমাল আমি উপহার দিয়েছি তাঁকে। আমার মায়ের রুমাল। মা পেয়েছিলেন বাবার কাছ থেকে। ও-রুমালে জাদুশক্তি আছে।"

"বলেন কী?" আয়াগো যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল,—"বলেন কী? সে-রুমাল যে কেসিও দিয়েছে বিয়াঙ্কাকে!"

ওথেলো আকাশ থেকে পড়লেন। কেসিও? বিয়াঙ্কা? কে বিয়াঙ্কা? কেসিও সে-রুমাল কী করে পায়?

আয়াগো ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল—কেসিও নিশ্চয়ই পেয়েছে দেস্‌দিমোনার কাছ থেকে! তা নইলে ওর হাতে তা কী করে যাবে?

ওথেলো কিছু বুঝতে পারেন না। দেস্‌দিমোনার কাছ থেকে? ওথেলোর দেওয়া ভালবাসার উপহার দেস্‌দিমোনা কেসিওকে দেবেন? এও কি সম্ভব?

আয়াগো ইঙ্গিতে বলল—"কেন দেবেন না? দেস্‌দিমোনাও রুমালখানা ভালবাসার উপহার বলেই দিতে পারেন কেসিওকে।"

আগুন জ্বলে উঠল।

আয়াগো প্রতি মুহূর্তে বিষ ঢালতে লাগল ওথেলোর কানে। দেস্‌দিমোনা অবিশ্বাসিনী, দেস্‌দিমোনা কেসিওর প্রতি অনুরাগিণী! ওথেলো প্রথমে কথাটা উড়িয়েই দিলেন, করলেন অবিশ্বাস, তার পরে বার বার শুনতে শুনতে সে-অবিশ্বাস ক্রমে উপে যেতে লাগল। দেস্‌দিমোনা সরল মনে তাঁর কাছে এসে বার বার কেসিওকে চাকরিতে বহাল করবার অনুরোধ জানান, আর ওথেলো সে-অনুরোধকে দেস্‌দিমোনার পাপেরই প্রমাণ বলে ধরে নেন আর রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। দেস্‌দিমোনা যদি কেসিওকে ভালই না বাসবে, তাহলে কেসিওর চাকরির জন্য তার অত মাথাব্যথা কেন?

ভাবে ভঙ্গীতে আয়াগো ওথেলোকে বোঝায়—"এ তো একান্তই স্বাভাবিক! খুব কমই দেখা গিয়েছে যে কোন নারী চিরদিন একই পুরুষকে ভালবেসেছে। তার উপর নারীর মনকে বেঁধে রাখতে হলে দুটো জিনিস পুরুষের থাকা চাই। সে হল রূপ আর বয়স। তার কোনটাই আপনার নেই। অথচ কেসিওর ও দু-দুটোই আছে।"

ওথেলো কান পেতে শোনেন, বিশ্বাস করব-না করব-না করেও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করেন আয়াগোর কথা। তাঁর মনে হয় দেস্‌দিমোনা নিশ্চয়ই অসতী, কেসিওর প্রতি তার নিশ্চয়ই অনুরাগ আছে। ওথেলোর সঙ্গে বিবাহের আগে থাকতেই কেসিওর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। সেই পরিচয় এখন প্রণয়ে দাঁড়িয়েছে। তা নইলে ওথেলোর রুমাল সে কেসিওকে দেয় কেন? একটা গুরুতর অপরাধের জন্য কেসিওকে চাকরি থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। এখন বার বার সেই কেসিওকে আবার কাজ দেওয়ার জন্য সে ক্রমাগত আবদার জানায় কেন?

ওথেলো পাগলের মত হয়ে গেলেন।

এরপর যখন দেস্‌দিমোনা আবার কেসিওর কথা বলতে এলেন তাঁকে, তখন তিনি সকলের সামনে প্রকাশ্যভাবে তাকে অসতী বলে গাল দিলেন। প্রহারও করলেন দেস্‌দিমোনাকে।

সতীলক্ষ্মী দেসদিমোনার ভাগ্যে এ কী চরম শাস্তি! এ-জীবনের ভার আর যেন তিনি বইতে পারেন না। সুখের সূর্য এত শীঘ্র অস্ত যাবে, তা ভাবতে পারেননি হতভাগিনী। প্রাণঢালা ভালবাসার বদলে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার যে কেউ দিতে পারে, তা স্বপ্নেও যে তিনি চিন্তা করতে পারেননি।

অপরাধ? কী তাঁর অপরাধ? দেস্‌দিমোনা ভেবে পান না। একমাত্র সেই রুমাল হারানো ছাড়া। ওথেলোর উপহার সেই রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরোটা হারিয়ে ফেলা যে অমার্জনীয় আর

মারাত্মক একটা অপরাধ বলে গণ্য হবে, তা সরলা নারী বুঝবেন কি করে? আগে বুঝলে সাবধান হওয়া যেত। এখন আর পরিতাপ করা ছাড়া উপায় কি? ওথেলো বলেছেন—তাঁর ভালবাসা ফিরে পেতে হলে সেই রুমাল তাঁকে দেখাতে হবে। কিন্তু কী করে দেখাবেন? সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেও তা পাওয়া যায়নি। হায়! একটা চক্ষু উপড়ে ফেলে দিলেও যদি রুমালখানা ফিরে পাওয়া যেত।

রোডেরিগো এসে আয়াগোকে ধরে,—"তুমি যে আমায় এত আশা দিলে, তার কী হল? দেস্‌দিমোনাকে উপহার দিতে হবে বলে আমার কাছে বহু মণি-মাণিক আদায় করেছ তুমি। তুমি বলেছ—সে সব নাকি দেস্‌দিমোনা গ্রহণও করেছে। তাহলে তো তার উচিত আমার উপর অনুগ্রহ দেখানো। দামী দামী উপহারও নেব, অথচ উপহার যে দিচ্ছে, তাকে কাছে ঘেঁষতে দেব না, এ কি হয়? কিন্তু দেখ, আমাকে সমুখে দেখলেও তো সে এমন ভাব দেখায় না যে সে আমায় চেনে! কী করে আমি বুঝব যে তুমি আমায় ঠকাওনি? হয় তুমি আমার মণিরত্ন ফেরত দাও, নয় তো এমন ব্যবস্থা কর যাতে অতি শীঘ্র আমি দেস্‌দিমোনাকে লাভ করতে পারি।"

আয়াগো মুশকিলে পড়েছে। খুব তাড়াতাড়ি জাল গুটিয়ে ফেলতে না পারলে সে নিজেই জড়িয়ে পড়বে সেই জালে। কেসিওর কাথাবার্তা থেকে এক্ষুনি ফাঁস হয়ে যেতে পারে যে, রুমাল সে দেস্‌দিমোনার কাছে পায়নি, কোন এক অজানা লোক তার ঘরে নিয়ে রেখে এসেছিল। রোডেরিগোও যে-কোন মুহূর্তে নালিশ করতে পারে যে দেস্‌দিমোনার ভালবাসা পাওয়া যাবে, এই প্রলোভন দেখিয়ে আয়াগো তার কাছে অনেক ধনরত্ন ঘুষ নিয়েছে। না, আর বিলম্ব করা নয়।

বিলম্ব ত নয়, কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করা যায়ই বা কেমন

করে? অনেক ভেবে আয়াগো মতলব করল—সে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে। রোডেরিগোকে বোঝাল যে কেসিও না মরলে সে দেস্‌দিমোনাকে পাবে না! কারণ দেস্‌দিমোনা রোডেরিগোর উপহার যদিও নিয়েছে তবু ভালবাসে সে কেসিওকেই।

আয়াগোর পরামর্শে মরিয়া হয়ে রোডিরিগো এক অন্ধকার রাতে কেসিওকে লক্ষ্য করে তরোয়াল হাঁকাল। কিন্তু তার বরাত মন্দ, কেসিও নিহত না হয়ে সামান্য আহত হলেন। আঘাত পেয়ে তিনি উলটে এমন এক ঘা বসিয়ে দিলেন যে রোডেরিগোও ধরাশায়ী হল।

তখন উভয়ের চীৎকার শুনে সেখানে এসে পড়লেন দুটি মস্ত মাননীয় লোক, যাঁরা ভেনিস থেকে সদ্য এসেছেন এই সাইপ্রাসে। আর তাঁদের সেখানে আসতে দেখে, ধূর্ত আয়াগো—আড়ালেই সে ওত পেতে ছিল—তাড়াতাড়ি এসে অন্ধকারের আড়ালে নিজের তরবারি বসিয়ে দিল রোডেরিগোর বুকে, যাতে ধরা পড়ে সে আয়াগোর আসল চরিত্র কারও কাছে প্রকাশ না করতে পারে।

রোডেরিগোর মৃত্যু হল! কেসিওকে বহন করে গৃহে নিয়ে যাওয়া হল চিকিৎসার জন্য।

এই যে ভেনিস থেকে সদ্য এসেছেন দু'জন মাননীয় লোক, এঁরা এসেছিলেন খুব দরকারী কাজে। মরিশেনিয়া প্রদেশে কিছু অশান্তির সৃষ্টি হওয়াতে ডিউক বীর ওথেলোকে সেখানে শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছেন। আর সাইপ্রাসে এখন অশান্তির কোন চিহ্ন না থাকায় সহকারী সেনাপতি কেসিওর উপর অর্পণ করেছেন সেখানকার শাসনভার।

কেসিও যে ইতিমধ্যে কর্মচ্যুত হয়েছিলেন, সে-সংবাদ তো ভেনিসের কর্তারা পাননি!

ভেনিসের এ আদেশ ওথেলো খুশী হয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না। কেসিও হবে এই সুখের সাইপ্রাসের শাসনকর্তা। ওথেলোকে চলে যেতে হবে সুদূর মরিশেনিয়ায়! দেস্‌দিমোনাকে কি তুলে

দিয়ে যেতে হবে কেসিওর হাতে?—ওথেলোর মনে এখন আর সন্দেহ নেই যে দেস্‌দিমোনার চরিত্র খারাপ। এ-অবস্থায় সে যে ওথেলোর সঙ্গে মরিশেনিয়ায় যেতে রাজী হবে, এমন ভরসা ওথেলো করবেন কী করে?

জাতিতে ওথেলো মুর, যারা সহজে রেগে যায়, আর রাগের মাথায় না করতে পারে এমন কাজ নেই। সেই মুরের রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল ওথেলোর সকল ধমনীতে।—"আমি তাকে হত্যা করব যাওয়ার আগে"—আয়াগোর সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে ওথেলো বলে বসলেন—"কেসিওর জন্য তাকে আমি জ্যান্ত রেখে যাব না।"

এ প্রস্তাবে সায় দিল আয়াগো খুশী হয়েই। দেস্‌দিমোনা মারা গেলেই এখন আয়াগো বাঁচে। তাহলে তার নিজের কুটিল আচরণ প্রকাশ হয়ে পড়বার আর কোন ভয় থাকে না।

আয়াগো পরামর্শ দিল—"মারুন তাকে, তবে অস্ত্র দিয়ে নয়। গলা টিপে হত্যা করুন। লোকে যেন বুঝতে না পারে যে কি করে তার মৃত্যু হল।"

ওথেলো তখন পাগল। কী তিনি করতে যাচ্ছেন, তা যেন তিনি বুঝতেই পারছেন না।

রাত্রি গভীর। শয্যায় শয়ন করেছেন দেস্‌দিমোনা। আজ তাঁর মনে একটা ভয়ের ছায়া জুড়ে বসেছে। সহচরী এমিলিয়াকে ডেকে বিবাহদিনের পোশাকটি পরিয়ে দিতে বললেন। পোশাক দেখে যেন ওথেলোর মনে পড়ে সেই বিবাহদিনের কথা, যেদিন কত আশা, কত ভালবাসায় উজ্জ্বল মনে হয়েছিল ভবিষ্যতের বিবাহিত জীবন। পোশাক দেখে যেন বিশ্বাস ফিরে আসে ওথেলোর অন্তরে যে বিবাহের দিনে নববধূ দেস্‌দিমোনা যে ভালবাসার পসরা নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, আজও সে পসরা তেমনি পরিপূর্ণ আর তেমনি পবিত্র রয়েছে। এক তিলও তা কমেনি বা নষ্ট হয়নি।

এমিলিয়াকে বিদায় দিয়ে দেস্‌দিমোনা অপেক্ষা করতে লাগলেন কতক্ষণে স্বামী আসেন।

কখন বুঝি একটু ঘুম এসেছিল অভাগিনীর চোখে, সেই মুহূর্তে পা টিপে টিপে ঘরে প্রবেশ করলেন ওথেলো। এক মুহূর্ত দেস্‌দিমোনার দিকে তাকিয়ে দেখলেন; অতীতের ভালবাসা হঠাৎ বন্যার মত এসে তাঁর অন্তরকে ভাসিয়ে দিয়ে গেল। তিনি নত হয়ে দেস্‌দিমোনাকে চুম্বন করলেন। একবার, দুইবার, বারবার।

ঘুম ভেঙে গেল দেস্‌দিমোনার। তিনি ডাকলেন—"ওথেলো! স্বামী! এস!"

যেন জাদুমন্ত্রে নেমে গেল বন্যার জল। চোখের পলকে ওথেলোর হৃদয় পাষাণ হয়ে গেল আবার, বললেন—"আমি তোমায় হত্যা করতে এসেছি, দেস্‌দিমোনা।"

প্রথমেই দেস্‌দিমোনার তো বিশ্বাসই হয় না সে কথা। তারপর যখন নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে প্রিয়তম স্বামী আজ নিষ্ঠুর ঘাতকে পরিণত হয়েছে, সে-ঘাতকের হাতে আজ তাঁর মরণ অনিবার্য, তখন কাতর হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন—"মেরো না আমায়! কেন মারবে? আমি অবিশ্বাসিনী নই!"

ওথেলো আর কোন কথা শুনতে রাজী নন। তাঁর রক্তে তখন শয়তান নৃত্য করছে, তিনি গলা টিপে ধরলেন দেস্‌দিমোনার!

এই সময় দারুণ গোলমাল শোনা গেল ঘরের দরজায়। কেসিও আহত ও রোডেরিগো নিহত হয়েছেন—এই খবর দিতে এসেছে এমিলিয়া। ডাকাডাকিতে ওথেলো দ্বার খুলতে বাধ্য হলেন।

খবর শুনিয়েই এমিলিয়া প্রভুপত্নীর শয্যার কাছে চলে এল। দেস্‌দিমোনার সরলতা ও মধুর স্বভাবের জন্য এমিলিয়া সত্যই তাঁকে ভালবাসত। সেই দেস্‌দিমোনা এখন নড়ছেন না, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন দেখে সে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। সে চীৎকারে একে একে বহু লোক এসে সমবেত হল ওথেলোর শয়নকক্ষে।

"কে এ কাজ করল ?"—জিজ্ঞাসা করে সবাই।

দেস্‌দিমোনা হঠাৎ যেন যমদ্বার থেকে ফিরে এলেন। যিনি প্রায় মরেই গিয়েছিলেন, সেই নারী হঠাৎ ক্ষণিকের জন্য চৈতন্য ফিরে পেলেন, ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলেন—"কেউ না, কেউ আমায় মারেনি, আমি আত্মহত্যা করেছি।"

মিথ্যা ?—মিথ্যা বটে! কিন্তু শত সত্যের চেয়েও পবিত্র এই মিথ্যা দেস্‌দিমোনার চরিত্রকে চিরদিনের জন্য দেবীর মর্যাদা দিয়ে গিয়েছে! পৃথিবীর সতীশিরোমণিদের ভিতরে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাঁর স্থান।

কিন্তু এমিলিয়া সব কথা প্রকাশ করে দিল। দেস্‌দিমোনার জন্য এমন শোক সে পেয়েছিল যে তার স্বামীর দুষ্ট চক্রান্তও সে গোপন রাখল না। তাই শুনে আয়োগো হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে আর অন্য কেউ বাধা দেওয়ার আগেই অস্ত্রের এক আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেলল!

আর ওথেলো ? এমিলিয়ার মুখে সব শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে দেস্‌দিমোনা কত পবিত্র ছিলেন। অনুতাপে তিনি আত্মহত্যা করলেন। মরবার সময়ে বলে গেলেন—"দেস্‌দিমোনাকে বড় বেশী ভালবাসতাম বলেই আমি তাকে হত্যা করেছি। ভুল করেছি অবশ্য ; কিন্তু বড় বেশী ভালবাসতাম বলেই এমন ভুল করেছি।"

রিচার্ড দি থার্ড

লণ্ডনের রাজপথে একদিন সকাল বেলায় দাঁড়িয়ে আছে এক অতি কদাকার পুরুষ। মানুষের একটা অঙ্গে খুঁত থাকতে পারে, দৈবাৎ বা দুটো অঙ্গে থাকাও সম্ভব। কিন্তু পথচরেরা অবাক্ হয়ে দেখছে এ-লোকটার প্রতি অঙ্গেই বিকৃতি। দু'একজন অবিবেচক হয়ত দুই একটা বিদ্রূপের কথাও উচ্চারণ করে ফেলছে মাঝে মাঝে; কিন্তু পাশের লোকেরা তখনি তাকে সতর্ক করে দিয়ে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভয়ে ভয়ে। কারণ এই অতি-কুৎসিত লোকটি ইংলণ্ডের মাথাওয়ালা ব্যক্তিদেরও মাথার উপরে বিরাজ করছেন বললে কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হয় না।

ইনি রাজভ্রাতা রিচার্ড, গ্লস্টারের ডিউক।

রাজভ্রাতা হলেই যে সে লোকের খুব ক্ষমতা বা সম্মান থাকবে, এমন কোন কথা অবশ্য সেই চারশো বছর আগেকার ইংলণ্ডে ছিল না। বরং হাতে কলমে অনেক সময়েই ঠিক উল্টো ব্যাপার

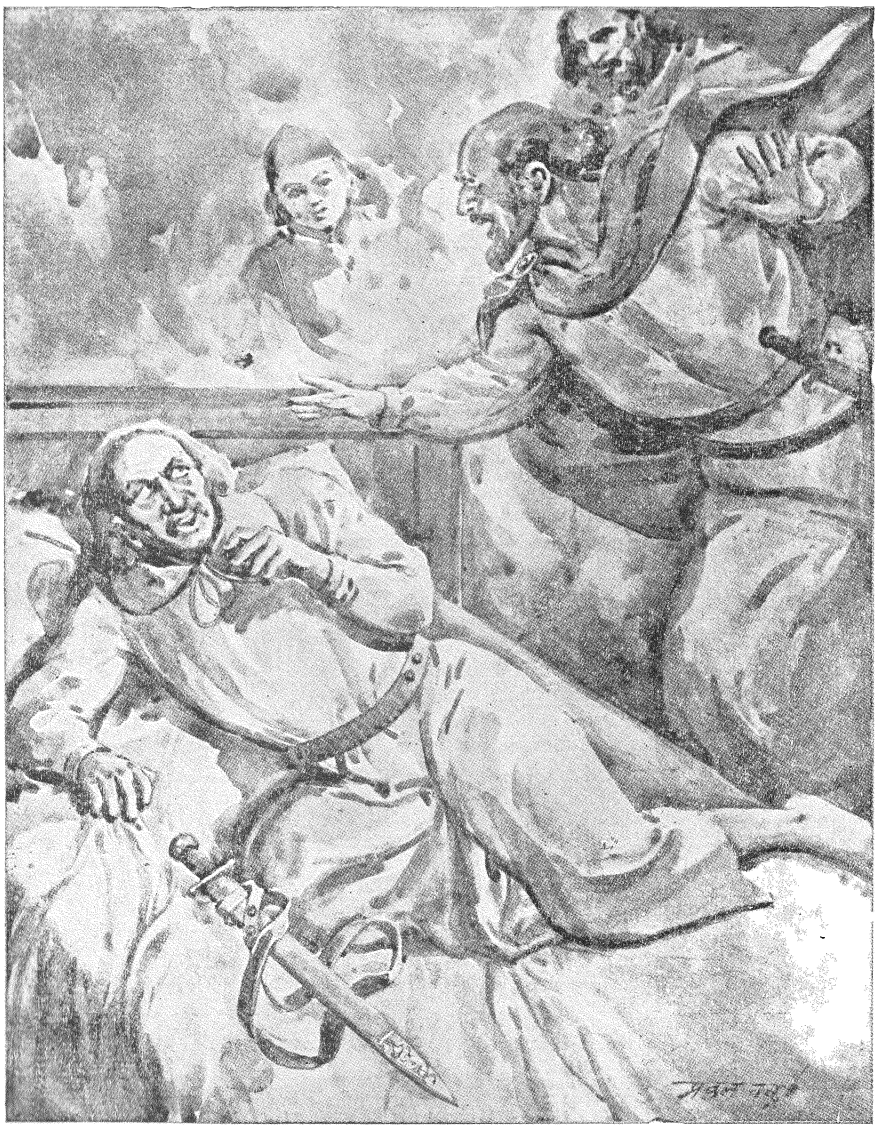

রাত্রে রিচার্ডের চোখে ঘুম নেই। তাঁর চোখের সামনে জেগে ওঠে বিভীষিকা। অতীতে যাদের তিনি হত্যা করেছেন তাদের প্রত্যেকের আত্মা এসে বলে গেল তাঁকে—কাল তুমি ধ্বংস হবে! নিহত হবে! নরকের পথে যাত্রা করবে কালকে।

দেখা যেত। রাজারা সবচেয়ে ভয় করতেন নিজেদের ভাইয়েদের। কখন যে তাঁরা অসন্তুষ্ট প্রজাদের নিয়ে দল গড়ে তোলেন, আর হঠাৎ বিদ্রোহপতাকা উড়িয়ে দেন, তার কিছুই স্থিরতা ছিল না। প্রজা বলতে অবশ্য এখানে বড়লোক ব্যারন ও রাজকর্মচারীদেরই বুঝতে হবে। চাষী মজুর শ্রেণীর লোকেদের তখন হিসাবের ভিতরেই ধরা হত না দেশে। তারা যে মানুষ, এটাই শাসকদের মাথায় তখন আসত না।

রাজার ভাইদের দেহে রাজবংশের রক্ত রয়েছে বলেই সাধারণ লোকে মেনে নিত যে দরকার বা সুযোগ হলে ওঁরাও হয়ত একদিন সিংহাসন দাবি করতে পারবেন। এবং সেই জন্যই রাজারা অন্যলোকের চাইতে নিজের ভাইকে অবিশ্বাস করতেন বেশী। কিন্তু গ্লস্টারের বেলায় অন্য রকম হয়েছিল। এঁকে অবিশ্বাস করা দূরে থাক, রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড এঁকে নিজের ডান হাত বলে মনে করতেন। গ্লস্টারও রাজার সুনজরের সুযোগ নিয়ে ধাপে ধাপে তাঁর পথ পরিষ্কার করে নিচ্ছিলেন।

ভাইদের মধ্যে তিনি সকলের ছোট। জ্যেষ্ঠ এডোয়ার্ড রাজা, তাঁর দুই পুত্র আছে। মধ্যম ভ্রাতা ক্লারেন্সের ডিউক, তাঁরও এক পুত্র রয়েছে। এতগুলি মাথা পেরিয়ে গ্লস্টারের ডিউক রিচার্ডের রাজা হওয়ার প্রশ্ন কোনদিন যে এদেশে উঠতে পারে, এ-কথাই কেউ সেদিন ভাবতে পারেনি,—না রাজা না প্রজা।

কিন্তু আর কেউ না ভাবুক, ভেবেছিলেন গ্লস্টার নিজে। দেহটা ভাঙ্গাচোরা হলে কি হয়, মনটা এঁর উচ্চাশায় ভরা। তা ছাড়া আরও একটা কথা, যা তিনি পেতে চান, তা-পেতে গিয়ে সমুখে বাধাবিপত্তি পড়লে, তাতে দমবার পাত্রও নন ইনি। গায়ের জোরে সব বাধা সমুখ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা ও অভ্যাস এঁর আছে। রাজা এডোয়ার্ডের আগে ষষ্ঠ হেনরী ছিলেন রাজা; এঁদেরই

বংশের অন্য শাখার দলপতি। বর্তমান রাজা এডোয়ার্ড ও গ্লস্টারের পিতা ছিলেন ইয়র্কের ডিউক। তিনি যখন রাজা হেনরীর বিপক্ষে দাঁড়িয়ে লড়াই শুরু করলেন, তখন এই গ্লস্টারের অসির আঘাতেই রাজা হেনরী মারা পড়েন, আর মারা পড়েন তাঁর পুত্র যুবরাজ এডোয়ার্ড, যাঁকে সবাই ভালবাসত।

গ্লস্টার তাই ভাবেন—

রাজহত্যার বদনামটা পড়েছে তাঁর ভাগ্যে, কিন্তু তার ফলভাগী হয়েছেন তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা এডোয়ার্ড। ভাগ্যের এই অবিচার খুশী হয়ে মেনে নিতে পারেননি গ্লস্টার। দুটো মানুষ হত্যা করে হেনরীর বংশের রাজমুকুট তিনি যদি এই বংশে এনে দিয়ে থাকেন, তাহলে আর গোটাকতক হত্যা করে এডোয়ার্ডের মাথা থেকে সে মুকুট নিজের মাথায় এনে বসাতে আপত্তিটা কী হতে পারে—তা বুঝতে পারেন না গ্লস্টার।

যাহোক, তিনি জাল বুনে চলেছেন গোপনে। তাঁর মনের কথা কেউ জানে না, কাউকে তিনি ডাকেন না পরামর্শ নেবার জন্য। একা বসে ভাবেন, তাঁর কুশ্রী মুখে মনের অসন্তোষ আর হিংসার ছাপ বীভৎস হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু মুখটা তাঁর এমনিই বীভৎস, তাতে এই অতিরিক্ত বীভৎসতা কারও চোখে পড়ে না, বা পড়লেও তা দেখে তাঁর মনের কথা অনুমান করে নেওয়ার মত বুদ্ধিমান লোক খুবই কম।

রাজার তিনি ডান হাত, তারই সুযোগ নিয়ে রাজপরিবারের ভিতর দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করেছেন তিনি। রানী এলিজাবেথের দুটি পুত্র ছিলেন,—ডর্সেট ও গ্রে। এঁরা রানীর আগের স্বামীর সন্তান। রানীর এই দুটি পুত্র ও রানীর ভাই আর্ল রিভার্স-এর সঙ্গে লর্ড হেস্টিংস-এর ছিল কলহ। এজন্য হেস্টিংসকে কিছুদিন আগে কারাদুর্গ টাওয়ারে বন্দী করা হয়। এখন গ্লস্টার রাজাকে পরামর্শ দিয়ে সেই হেস্টিংসকে এনেছেন খালাস করে, যাতে রানীর

ভাই ও পূর্বপক্ষের পুত্রদের পিছনে লেলিয়ে দেওয়ার মত একজন লোক পাওয়া যায়।

হেস্টিংসকে মুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে রাজার আদেশ বেরুলো—রাজার মেজো ভাই ক্লারেন্সকে টাওয়ারে আবদ্ধ করা হোক।

গ্লস্টার রাজপথে দাঁড়িয়ে আছেন—এমন সময় টাওয়ারের সৈনিকেরা ক্লারেন্সকে নিয়ে সেই পথ দিয়ে যায়। গ্লস্টার যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

"এ কি ভাই! তোমার এ কী দশা? তোমায় বন্দী করল কে?"

"কে আবার?" শুকনো হাসি হেসে ক্লারেন্স বললেন, "রাজা ছাড়া কে আর আমায় বন্দী করতে পারে?"

"রাজা?" অবিশ্বাসের সুরে গ্লস্টার বললেন, "রাজা নিজের ভাইকে বন্দী করবেন? বিশেষতঃ তোমার মত ভাইকে, যে কোনরকম ঝামেলার ভিতর থাকে না, রাজার উপর যার ভক্তির সীমা নেই বললেই চলে? এ হতেই পারে না। রাজার নাম করে তোমায় বন্দী করেছে রানীর ঐ ভাই আর আগের পক্ষের পুত্রেরা! আমাদের সবাইকে একে একে সরিয়ে নিজেরা সকল ক্ষমতা দখল করবার চেষ্টায় রয়েছে তারা। যা-ই হোক তুমি চিন্তা কোরো না। রাজা পীড়িত বলে আমি তাঁর কাছে আজকাল বেশী যাতায়াত করি না; তারই সুযোগে বদমাইশেরা তোমায় বিপদে ফেলেছে। কিন্তু এখন আর আমি চুপ করে থাকব না। তোমায় মুক্ত করে তবে আমার অন্য কাজ।"

ক্লারেন্স ভাইয়ের স্নেহের এই পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর ভয় আর দুশ্চিন্তা কমে গেল অনেকখানি। কতকটা হালকা মনেই তিনি সৈনিকদের সঙ্গে টাওয়ারের পথে অগ্রসর হলেন।

তাঁকে রওনা করে দেবার পর গ্লস্টার যেন চাপা হাসির আবেগ আর চেপে রাখতে পারলেন না। কী মূর্খ ঐ ক্লারেন্স! ওকে

টাওয়ারে নিয়ে তুললেন গ্লস্টার। রানীকে বললেন টাওয়ারের ভিতর শত্রু ঢুকতে পারবে না; রাজ্যাভিষেক যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ তাঁরা ওখানেই নিরাপদে অবস্থান করুন। গ্লস্টার হলেন রাজপুত্রদের কাকা, অভিভাবক, কত স্নেহ তাঁর ভাইপোদের উপরে! তাঁরা কোন বিপদে না পড়েন, এইটিই গ্লস্টারের ইচ্ছা।

রাজপুত্রেরা রইলেন টাওয়ারে, রানী রইলেন প্রাসাদে পরদিন প্রভাতে পুত্রদের দেখবার জন্য রানী টাওয়ারে যেতেই দুর্গের অধ্যক্ষ ব্রাকেনবেরি জানালেন—রাজ্যপালের আদেশ এই যে, রাজপুত্রদের সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে পারবে না; এমন কি তাঁদের মাতা স্বয়ং রানীও না। অভাগিনী রানী বিলাপ করতে করতো ফিরে এলেন। তাঁর পুত্রেরা যে ব্যাধের জালে আবদ্ধ হয়েছে, ত বুঝতে আর তাঁর বাকী রইল না। এ জাল ছিন্ন করে বেরুনো আর বুঝি তাদের ভাগ্যে নেই।

তার পরই সংবাদ এল যে পম্‌ফ্রেট দুর্গে নিহত হয়েছেন রিভার্স, গ্রে আর ভগান!

এদেরই তিনজনের চক্রান্তে একদা বন্দী হয়েছিলেন লর্ড হেস্টিংস।

এইবার গ্লস্টার বলে পাঠালেন হেস্টিংসকে—"তোমার শত্রু নিপাত করেছি আমি; এস, তুমি আমার দলভুক্ত হও। সাহায্য কর আমায়।"

কিন্তু হেস্টিংস অত সহজে ভুলবার লোক নন। তিনি সন্দেহ করলেন গ্লস্টারকে। এখন ওঁর দলভুক্ত হওয়ার মানেই হল রাজপুত্রদের বিপক্ষে যাওয়া। হয়ত তাঁর হাত দিয়েই গ্লস্টার হত্যা করতে চাইছেন রাজপুত্রদের। তিনি স্বীকৃত হলেন না ওর সেঙ্গ মিশতে।

এর ফল দাঁড়াল এই যে একদিন যখন বড় বড় লর্ড ও শাসনকর্তাদের একটা পরামর্শ সভা চলেছে, তখন গ্লস্টার সেই সভার

মাঝখানেই হেস্টিংসকে বন্দী করলেন। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘাতকের উপর হুকুম দিলেন তাঁর ধড় থেকে মাথাটি নামিয়ে দেবার জন্য। এর পর থেকে বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হল ইংলণ্ডে। কার কখন প্রাণ যায়, কে জানে।

লর্ড বাকিংহাম ডান হাত হয়ে দাঁড়িয়েছেন গ্লস্টারের। দুইজনে চুক্তি হয়েছে—গ্লস্টার যাতে সিংহাসনে বসতে পারেন, তার সাহায্য বাকিংহাম করবেন। আর গ্লস্টার সিংহাসনে বসবার পরে হিয়ারফোর্ডের বৃহৎ জমিদারি তিনি বকশিশ পাবেন গ্লস্টারের কাছে। চুক্তি হয়ে গেল; বাকিংহাম কাজে নামলেন। আর গ্লস্টার নিজে এমনি একটা ভেক ধরলেন যেন সংসারের উপর তাঁর বিরাগ এসে গিয়েছে। ভগবান ছাড়া অন্য কোন কিছুতে তাঁর আর মন বসছে না।

লর্ড মেয়র লণ্ডনের পৌরসভার কর্তা। জনসাধারণের মনের ভাব তাঁর মুখ দিয়েই বরাবর প্রকাশ পেয়ে থাকে। তাঁর কার্যালয় হল গিল্ড্‌হল। সেইখানে নাগরিকদের এক সভা ডাকলেন বাকিংহাম। জনগণকে বোঝাতে লাগলেন—রাজপুত্র এডোয়ার্ড ও ইয়র্ক সত্যি সত্যি রাজবংশের ছেলে নয়; তাদের জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ আছে। এ-অবস্থায় তাদের কাউকে সিংহাসনে বসানো কোনমতেই প্রজাদের পক্ষে সুবিধাজনক হবে না। তার উপর তারা আবার নাবালক। দুর্বল বা নাবালক রাজার শাসনে দেশে শান্তিসুখের সম্ভাবনা কোথায়? তার চেয়ে রাজভ্রাতা গ্লস্টারকে সিংহাসনে বসানো হোক। তিনি বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন, রাজনীতিও অন্য কেউ বোঝে না তাঁর মত। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর জন্ম সম্বন্ধে কোন সন্দেহ এ-যাবৎ কেউ করেনি। অতএব তাঁকে রাজপদে অভিষেক করে ইংলণ্ডের উন্নতির পথ পরিষ্কার করা উচিত।

এ প্রস্তাব আশ্চর্য ত বটেই। একেবারে নতুনও বটে। এর

জন্য জনসাধারণ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। 'হাঁ' কি 'না' কোন শব্দই তারা করল না। অবস্থা ভাল নয় দেখে বাকিংহামের নিজেরই অনুচরেরা সভাক্ষেত্রের এক কোণে সমবেত হয়ে চীৎকার করে উঠল—"জয় ডিউক রিচার্ডের জয়! জয় গ্লস্টারের জয়! তাঁকেই আমরা রাজা করব।"

সভাগৃহের একপাশে উঁচু মাচার উপর বসে ছিলেন গণ্যমান্য লোকেরা। সেইখান থেকে বাকিংহাম বলে উঠলেন—"তাহলে জনসাধারণ সবাই এ-প্রস্তাবে সায় দিচ্ছেন। বেশ, তাহলে আমি আপনাদের পক্ষ থেকে গ্লস্টারের ডিউক মহোদয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে সিংহাসনে বসবার জন্য মিনতি জানাব। তবে এ-প্রস্তাবে তিনি রাজী হবেন কিনা, আমার খুবই সন্দেহ আছে। কারণ, আপনারা জানেন যে—পৃথিবীর কোন ব্যাপারেই তাঁর আর মন নেই। তিনি সব সময়ে যাজকগণের সঙ্গেই আছেন। ধর্ম বিষয়ের আলোচনাই করছেন। ইহকালের চিন্তা ছেড়ে পরকালের কথাই এখন ভাবছেন তিনি।

কয়েকজন নাগরিক আর লর্ড মেয়রকে সঙ্গে নিয়ে বাকিংহাম চলে গেলেন গ্লস্টারের বাড়িতে। গ্লস্টার তো তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেই নারাজ। কারণ অমূল্য সময় অপব্যয় করতে তাঁর ইচ্ছা নাই। ততক্ষণ ধর্মের কথা ভাবলে তাঁর পরকালের পথ পরিষ্কার হবে।

যাই হোক, বাকিংহাম বার বার খবর পাঠানোর পর অবশেষে তিনি দেখা দিলেন। তাঁর হাতে বাইবেল, দুই পাশে দুইজন নামকরা যাজক। এসেই বললেন—"আপনারা কেন আমার ঈশ্বরচিন্তায় বাধা দিচ্ছেন, তা জানি না। যা বলবার দুই এক কথায় বলুন।"

বাকিংহাম বললেন—"দেশটা অরাজক হতে বসেছে। এ-সময়ে আপনি সিংহাসনে না বসলে আমাদের আর রক্ষা নেই। আপনাকে রাজা হতে হবে।"

গ্লস্টার একেবারেই উড়িয়ে দিলেন এ-প্রস্তাব। এসব কথা তিনি শুনতেই চান না। তিনি সংসার ছাড়বেন ঠিক করেছেন, মঠে গিয়ে কাটিয়ে দেবেন জীবনের বাকী দিন কয়েকটা। রাজ্যশাসনের হাজার ঝামেলার ভিতর তিনি মাথা বাড়িয়ে দেবেন না কোন মতেই।

বাকিংহাম অনেক কান্নাকাটি করে বললেন—"এ ভিন্ন উপায় নেই, দেশটা রসাতলে যাবে। দেশের মুখ চেয়ে আপনাকে নিজের শান্তিসুখের আশাও ত্যাগ করতেই হবে। মঠে বাস করার আনন্দের লোভে আমাদের আপনি কখনোই ভাসিয়ে দিতে পারবেন না। জাতির একমাত্র ভরসা, দেশের একমাত্র রক্ষক আপনি; রাজ্যভার আপনাকে নিতেই হবে।"

শেষপর্যন্ত একান্ত অনিচ্ছাতেই যেন গ্লস্টার সিংহাসনে বসতে রাজী হলেন।

পরদিনই হল তাঁর অভিষেক।

অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পরমবন্ধু বাকিংহামকে নিভৃতে ডেকে বললেন—"বন্ধু! আমি রাজা হতে চাই।"

"রাজা তো আপনি হয়েছেন।"—অবাক্ হয়ে উত্তর করলেন বাকিংহাম।

"হয়েছি। কিন্তু এ-হওয়া কি পাকাপাকি হওয়া? চতুর্থ এডোয়ার্ডের পুত্রেরা জীবিত রয়েছে। প্রজাদের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না যে আমি রাজা হই। তারা যে-কোন দিন টাওয়ার থেকে ঐ বালক দুটোকে বার করে এনে সিংহাসনে বসাতে পারে!"

রাজার কথা বুঝতে পেরেও না-বোঝার ভান করতে লাগলেন বাকিংহাম। রাজা তাঁকে দিয়ে শিশুহত্যা করাতে চান—সেটা বাকিংহামের তেমন ভাল লাগছে না।

তাঁর মুখে কোন জবাব নেই দেখে রাজা এবার খোলাখুলি বলেই ফেললেন—"তোমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে বন্ধু। বুঝতে পারছ

না? আমি চাই যে আমার পথের ঐ দুটো কাঁটা সরিয়ে ফেলা হোক! ওদের মেরে ফেলতে হবে।"

"আমি ভেবে দেখি মহারাজ!" এই বলে বাকিংহাম বিদায় নিয়ে গেলেন তখনকার মত।

ভেবে দেখা? রাজার আদেশ পালন করতেই হবে, ভাবনা-চিন্তার কোন অবকাশ সেখানে নেই। যে ভাবতে বসে, সে সমুখে হাজার বাধা দেখতে পায়। আদেশ পালন সে করতে পারে না। গ্লস্টার এমন লোকের উপর কোন কাজের ভার দিতে চান না, যে আদেশ পেয়েই ভাবতে বসবে। তার দ্বারা কাজ ত হবেই না, অকাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বাকিংহাম ভাবতে গেলেন। রাজা ডেকে পাঠালেন টাইরেলকে। এ একটা বেপরোয়া লোক। যে-কোন উপায়ে নিজেকে বড় করে তোলা ছাড়া জীবনে এর অন্য কোন লক্ষ্য নেই। অর্থলোভে না-করতে পারে, এমন কাজ নেই। রাজার হুকুম পেয়ে সে তার সহকারীদের নিয়ে টাওয়ারে প্রবেশ করল। মুখে বালিশ চাপা দিয়ে হত্যা করল দুই অসহায় রাজপুত্রকে। উপড়ে ফেলল গ্লস্টারের পথের কাঁটা।

বাকিংহামের সংগে একটা চুক্তি ছিল গ্লস্টারের গোড়া থেকেই—হিয়ারফোর্ডের জমিদারি দেওয়া হবে বাকিংহামকে।

এইবার বাকিংহাম এসে প্রার্থনা করলেন—হিয়ারফোর্ডের জমিদারি, চুক্তি অনুসারে তাঁকে দিয়ে দেওয়া হোক।

কিন্তু রাজপুত্রদের হত্যা করতে অস্বীকার করার দরুন গ্লস্টার তখন বাকিংহামের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি শুধু—"দেবার মত মেজাজ আজ আমার নয়"—এই একটিমাত্র কড়া কথা বলে বাকিংহামের নিকট থেকে দূরে চলে গেলেন।

বাকিংহাম বুদ্ধিমান লোক। হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, বুঝতে তাঁর দেরি হল না। রাজা রেগেছেন। এইবার হেস্টিংসের মত

তাঁরও মাথাটি যাবে, তা তিনি বুঝতে পারলেন। কাউকে কিছু না বলে তিনি লণ্ডন ছেড়ে পলায়ন করলেন, আর গোপনে সৈন্য যোগাড় করতে লাগলেন—রিচমণ্ডের সাহায্যের জন্য।

কে এই রিচমণ্ড? তাঁর পরিচয়টা এইবার বলে নেওয়া যাক। গ্লস্টারেরা সব ইয়র্ক বংশের লোক।

রিচমণ্ড ল্যাংকাস্টার বংশের। শেষ ল্যাংকাস্টার রাজা ষষ্ঠ হেনরী মরার আগে একদা সবাইকে বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডের সিংহাসন একদিন রিচমণ্ডেরই হবে। সে কথা শুনতে পেয়ে ইয়র্ক রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড ভয়ানক ক্ষেপে যান রিচমণ্ডের উপরে। তাঁকে ধরে এনে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে থাকেন। রিচমণ্ড ভয়ে পালিয়ে গিয়ে ফরাসী দেশে আশ্রয় নেন।

এতদিন পরে আজ তিনি ইংলণ্ডে ফিরে আসবার আয়োজন করেছেন। চতুর্থ এডোয়ার্ড মারা গিয়াছেন, তাঁর পুত্রদের মেরে ফেলা হয়েছে। বড় বড় বংশের ব্যারন ও পদস্থ রাজকর্মচারীরা সদাই ভয়ে ভয়ে রয়েছেন। কার কখন মাথা যাবে, কিছুই বলা যায় না। দেশটা যেন আরজক; কেউ গোপনে খুন হচ্ছে, কারও মাথা প্রকাশ্যে ঘাতকের হাতে কাটা পড়ছে। এমন দিন যাচ্ছে না যেদিন একটা না একটা বড় লোক মারা পড়ছে ইংলণ্ডে।

রাজধানী থেকে দূরে বাস করেন যে সব বড় বড় জমিদার, তাঁরা সবাই দূত পাঠিয়েছেন—রিচমণ্ডকে ইংলণ্ডে আসবার জন্য অনুরোধ করে। রিচমণ্ড আসছেন, সংবাদ পৌঁছেচে এখানে। অনেক জমিদার, অনেক দুর্গস্বামী—এরই মধ্যে গ্লস্টারকে রাজা বলে মানতে অস্বীকার করেছেন; অনেকে শুধু অপেক্ষায় রয়েছেন রিচমণ্ড কখন পৌঁছোবেন।

রাজদরবারে এখন প্রায় সবাই নতুন লোক, নতুন রাজা রিচার্ডের আমদানী করা ভুইফোঁড়। পুরাতনের ভিতর আছেন শুধু স্ট্যান্‌লি, মৃত হেস্টিংসের বিশেষ বন্ধু। এই স্ট্যান্‌লিকে রিচার্ড পছন্দ করেন

না, বিশ্বাসও করেন না। এতদিন তাঁকে হত্যাই করে ফেলতেন, কিন্তু তাতে একটু অসুবিধা আছে। হত্যা করে ফেললে তাঁর বিস্তীর্ণ জমিদারি থেকে সৈন্য সাহায্য আর পাওয়া যাবে না। তাই তিনি এক কৌশল করলেন। স্ট্যান্‌লির পুত্র জর্জকে আটক করে রাখলেন দরবারে। স্ট্যান্‌লিকে বললেন—জমিদারিতে গিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে আনতে। সতর্ক করে দিলেন—স্ট্যান্‌লির দিক্ থেকে একটুও বিশ্বাসঘাতকতার লক্ষণ দেখতে পেলে সেই দণ্ডেই জর্জের মাথা কাটা যাবে।

স্ট্যান্‌লি চলে গেলেন জমিদারি থেকে সৈন্য আনতে। ওদিকে রিচমণ্ড এসে ইংলণ্ডের পশ্চিম উপকূলে জাহাজ থেকে নামলেন।

বাকিংহাম এতদিন বসে অনেক তোড়জোড় করেছেন। এইবার বিরাট সৈন্যদল নিয়ে অগ্রসর হলেন রিচমণ্ডের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বাকিংহামের—পাহাড় থেকে নামল দারুণ বন্যা, তার তোড়ের মুখে পড়ে ভেসে গেল বাকিংহামের সমস্ত সৈন্য। তিনি নিজে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেন বটে, কিন্তু রাজা রিচার্ডের লোকেরা ধরে ফেলল তাঁকে। রাজার আদেশে তাঁর মাথা সঙ্গে সঙ্গে কাটা গেল। রিচার্ডের উপকারের জন্য অনেক কিছু পাপ তিনি করেছিলেন, তারই সাজা নিতে হল ভগবানের বিচারে।

এদিকে বন্যায় কিছু ক্ষতি রিচমণ্ডেরও হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অগ্রসর হয়ে এলেন বস্‌ওয়ার্থের প্রান্তরের দিকে। সেইখানে রিচার্ড এসে তাঁকে বাধা দিলেন, বিরাট সৈন্যদল নিয়ে।

রিচার্ডের সৈন্য রিচমণ্ডের সৈন্যের তিনগুণ। তার উপর নরফোকের ডিউক ও তাঁর পুত্র আর্ল অব্ সারে তাঁর সৈন্য চালনা করছেন। এঁরা দুইজনেই খুব বড় সেনাপতি। উপর থেকে দেখলে মনে হয়—রিচমণ্ডের ছয় হাজার সৈন্য রিচার্ডের আক্রমণের প্রথম ঢেউয়েতেই ভেসে চলে যাবে।

কিন্তু ভিতরের অবস্থা যাঁরা বোঝেন, তাঁরা কেউ আশা করতে পারেননি যে রিচার্ডের জয় হবে এ-যুদ্ধে। রিচার্ড হত্যাকারী, রিচার্ড অনাচারী, ভগবান ও মানুষ—সবাইয়েরই অভিশাপ রয়েছে রিচার্ডের উপরে। তাঁর সৈন্যদের ভিতরে কারও মনেই এক তিল ভক্তি নেই রাজার উপরে। প্রথম সুযোগেই তারা রিচার্ডকে ত্যাগ করে রিচমণ্ডের পক্ষে চলে যাবে।

যুদ্ধের আগের রাত্রে—

যে-যাঁর শিবিরে বিশ্রাম করছেন—দুই দলের দুই নায়ক। রিচমণ্ড ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন—"আমার দেশ আজ পড়েছে অশান্তির কবলে, অবিরত দানবের অত্যাচার চলেছে তার উপরে, হত্যাকারীরা তার বুকে চড়ে নৃত্য করছে দিনের পর দিন। আমার সেই অভাগিনী মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমি প্রার্থনা করি—আমায় তুমি দয়া করে বিজয়ী কর।"

বিবেক যার নির্মল, মৃত্যুকে শিয়রে নিয়েও সে শান্তিতে ঘুমোতে পারে। রিচমণ্ড গাঢ় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

আর ওদিকে রিচার্ড? তাঁর চোখে ঘুম নেই। একটু ঘুমের ঘোর চোখে নেমে আসছে, আর ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখে তিনি চমকে ওঠেন। দেখতে পান যেন একে একে ভয়াবহ প্রেতমূর্তিরা এসে তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়াচ্ছে, আর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে তাঁকে। রাজা ষষ্ঠ হেনরী, তাঁর পুত্র এডোয়ার্ড, রাজা চতুর্থ এডোয়ার্ড, তাঁর দুই পুত্র, রিভার্স, গ্রে, ভগান, হেস্টিংস, সর্বশেষে বাকিংহাম—প্রত্যেকেরই আত্মা এসে অভিশাপ করে গেল—"কাল যুদ্ধে তুমি ধ্বংস হবে, নিহত হবে। নরকের পথে যাত্রা করবে তুমি!"

আর রিচমণ্ড?—ঐ সব আত্মাই যেন তাঁরও শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়াল একে একে। এখন আর তাদের মূর্তি ভয়াবহ নয়, বরং অতি সুন্দর। মিষ্ট হাসি হেসে তারা তাঁকে আশীর্বাদ করল—"কাল যুদ্ধে

তুমি জয়ী হও, সিংহাসনে উপবেশন কর তুমি। অভাগা ইংলণ্ডে শান্তি ও সুখ ফিরিয়ে আন রিচমণ্ড!"

রিচার্ড জাগলেন—সারা রাত বিভীষিকা দেখে দেখে মন তাঁর মুষড়ে রয়েছে, দেহেও কিছুমাত্র বল পাচ্ছেন না। জেগেই ডেকে পাঠালেন স্ট্যান্‌লিকে। স্ট্যান্‌লি এলেন না; সৈন্য নিয়ে নিজের শিবিরে বসে রইলেন। ক্রুদ্ধ রিচার্ড আদেশ দিলেন—"ওঁর পুত্র জর্জকে কেটে ফেল এখুনি।"

কিন্তু এতে বাধা দিলেন সেনাপতি নরফোক। দারুণ যুদ্ধ সমুখে; এ-সময়ে সৈন্যবাহিনীর সামনে একটা নিষ্ঠুর খুনোখুনি করে তাদের মন খারাপ করে দেওয়া উচিত হবে না। যুদ্ধজয়ের পর তখন যাকে যেমন দেওয়া দরকার, দণ্ড বা পুরস্কার—তা দেওয়ার প্রচুর সময় জুটবে।

যুদ্ধ হল। বীরত্বের সঙ্গেই যুদ্ধ করলেন রিচার্ড। কিন্তু প্রথমেই তাঁর যুদ্ধের ঘোড়া নিহত হল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন —"ঘোড়া! ঘোড়া! আমার রাজ্যের বিনিময়ে একটা ঘোড়া কেউ দাও!"

এদিকে তাঁর প্রধান সেনাপতি নরফোক যুদ্ধে মারা গেলেন। সৈন্যদল এলোমেলো হয়ে পড়ল। রিচমণ্ডের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে গেল রিচার্ডের। রিচার্ড নিহত হলেন। যুদ্ধ শেষ।

রিচার্ডের সৈন্য সবাই গিয়ে বিজয়ী রিচমণ্ডের দলে ভিড়ল। দেশে শান্তি ফিরে এল আবার। সপ্তম হেনরী নাম গ্রহণ করে রিচমণ্ড ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। তৃতীয় রিচার্ডের অল্পদিনের রাজত্ব দেশের ইতিহাসে একটা কালিমাখা অধ্যায় হয়ে রইল চিরদিনের জন্য।

এ্যান্টনি এন্ড ক্লিওপেট্রা

রোমক জগতের দিক্‌পাল পুরুষ জুলিয়াস সীজার। শত্রুরা মিলে হত্যা করল তাঁকে।

তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলেন মার্ক এ্যান্টনি আর অক্টেভিয়াস সীজার। এ্যান্টনি তাঁর অনুগত সেনাপতি আর অক্টেভিয়াস তাঁর ভাগিনেয়। নিজের ছেলে ছিল না বলে সীজার তাঁকে দত্তক নিয়েছিলেন।

সিনেট সভার এক ধনী-মানী সদস্য ছিলেন লেপিডাস। তাঁকে দলে টেনে নিয়ে এ্যান্টনি আর অক্টেভিয়াস রোমে চালু করলেন ত্রয়ীয় শাসন। রোম সাম্রাজ্যকে ভাগ করা হল তিন অংশে। খাস রোম ও পশ্চিম ইউরোপের শাসনভার গ্রহণ করলেন অক্টেভিয়াস সীজার। আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার রাজ্যগুলি পেলেন এ্যান্টনি, বাদ-বাকী সব দেশেই লেপিডাসের অধিকার কায়েম হল।

মিসর ছিল প্রায় স্বাধীন। নামে রোমের অধীন হয়েও টলেমি রাজবংশ নিজেদের ইচ্ছামত রাজত্ব করতেন সেখানে। এ্যান্টনি যখন আফ্রিকায় এলেন, তখন ক্লিওপেট্রা মিসরের রানী।

এ্যান্টনির খাতির করবার জন্য ক্লিওপেট্রা সিড্‌নাস পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। নীলনদের উপর দেখা হল দুজনে! সে জাঁকজমকের তুলনা হয় না। সে যেন স্বর্গেরই ব্যাপার, এ-পৃথিবীর কিছু নয়। ক্লিওপেট্রা সেজে এসেছেন দেবীর বেশে। তাঁর নৌকাখানি জলের উপর ভাসছে একখানি সোনায় গড়া সিংহাসনের মত। তার গায়ে হীরা-মণি-মুক্তা বসানো। সে সিংহাসন আলো করে বিরাজ করছেন ক্লিওপেট্রা, সারা পৃথিবীর সেরা রূপসী।

এ্যান্টনি আফ্রিকা এশিয়ার সম্রাট্‌, যে বিশাল সৈন্যদলের তিনি সেনাপতি, তা কখনো কোনও যুদ্ধে পরাজয় মানেনি। আর ক্লিওপেট্রা ক্ষুদ্র মিসরের রানী, তায় অবলা। এ্যান্টনিকেই শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাবার কথা ক্লিওপেট্রার; কিন্তু দেখা যখন হল, তখন ঘটনা ঘটল অন্যরকম। এ্যান্টনিই নীচু হলেন ক্লিওপেট্রার সমুখে। রূপসীর রূপ দেখে ভুলে গেলেন যে তিনিই প্রভু, তিনিই সম্রাট্‌, তিনিই বিজয়ী বীর। পৃথিবীর লোক দেখল ক্লিওপেট্রাই বিজয়িনী, আর এ্যান্টনি পরাজিত, এ্যান্টনি বন্দী।

ক্লিওপেট্রা মিসরে ফিরলেন, এ্যান্টনিকে নিয়ে। রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় শুরু হল নিত্য উৎসব। সারা রাত্রি মশালের আলোকে ঝলমল করে মহানগরীর রাজপথ। মাতাল হয়ে আনন্দ কোলাহলে ইচ্ছামত বেড়িয়ে বেড়ান এ্যান্টনি; সঙ্গে থাকেন ক্লিওপেট্রা। সঙ্গে থাকে বহু লোক, তারা সবাই একসাথে গান গায়, নানা বাদ্য বাজতে থাকে এক সুরে, কেবল নেশার ঝোঁকে বারে বারেই তাল কেটে যায় তাদের গানে ও বাজনায়। যে রোমক সেনাপতিকে তারা দূর থেকে দেবতা বলে মনে করত, চোখের উপর তার এই মাতলামি আর বিলাসিতা দেখে নিদ্রাহীন নগরবাসীরা চুপি চুপি কী যে বলাবলি করে, তা ক্লিওপেট্রা বা এ্যান্টনি কারো কানেই পৌঁছায় না।

অবশ্য পৌঁছালেও তাঁরা তাতে কর্ণপাত করতেন না। প্রজার

এ্যাণ্টনি আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে এসে ক্লিওপেট্রাকে নিরাপদ অক্ষত দেখে আশ্বস্ত হলেন।

কথায় কান দিতে হবে, এমন ধারণা সেকালের রাজাদের ছিল না।

আর অ্যাণ্টনি? তিনি তো রাজাদেরও রাজা। যে-কোন দিন তাঁর শিবিরে বা দরবারে পশ্চিম এশিয়ার দশটা রাজার দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাঁরা এসেছেন অ্যাণ্টনির অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য; কারণ তাঁদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাই অ্যাণ্টনি। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে অ্যাণ্টনির ইচ্ছা ঠিক যেন ঈশ্বরেরই ইচ্ছা, তাতে বাধা দেবার শক্তি কারও নেই। তাঁর ইঙ্গিতে রাজার সিংহাসন যায়, তিনি খুশী হলে ভিখারীর মাথায় মুকুট ওঠে।

মিসরের গরীব প্রজারা যদি গোপনে তাঁর নিন্দা করেই, তাতে এ-হেন অ্যাণ্টনি ভয় করবেন কেন?

অধীনস্থ সৈনিক সেনাপতিদের মতামতকেই বা মূল্য দেবেন কেন?

বিলাস-ব্যসন সীমা ছাড়িয়ে ওঠে দিনের পর দিন। তখন প্রতিবাদ আসে রোম থেকে।

অ্যাণ্টনি বীর, অ্যাণ্টনি সম্রাট, অ্যাণ্টনি দেবতা। কিন্তু তাঁর মত বীর, সম্রাট ও দেবতা পৃথিবীতে আরও ত দুজন আছেন। রোমক জগতের শাসনভার একা অ্যাণ্টনির উপর তো নয়। তাঁর অংশীদার আছেন দুজন; তাঁরাও নিজের নিজের রাজ্যসীমার মধ্যে সর্বেসর্বা, সম্রাট্ পদবীতে অধিকার তাঁদেরও আছে। তিনজনের অধিকৃত দেশগুলি নিয়েই রোম সাম্রাজ্য। কাজেই সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনজনই মিলিতভাবে দায়ী। একজনের আচরণে সাম্রাজ্যের ক্ষতি ঘটবার সম্ভাবনা দেখলে অন্য দুইজন আপত্তি করতে পারেন বই কি।

তাই প্রতিবাদ এল রোম থেকে। অক্টেভিয়াস সীজার দূত পাঠালেন অ্যাণ্টনিকে।

প্রতিবাদের ভিত্তি ছিল দুইরকম। একটি সাম্রাজ্যের দিক্ থেকে, অপরটি অক্টেভিয়াসের নিজের দিক্ থেকে। সাম্রাজ্যের শাসন ব্যাপারে লাভ-ক্ষতি কার কতটা হচ্ছে, তা নিয়ে বিবাদ বেধেছে সীজার ও অ্যাণ্টনির ভিতরে। সেইটির উপরেই জোর দিয়েছেন সীজার।

দ্বিতীয়তঃ—অ্যাণ্টনির আপত্তিজনক আচরণ, বিলাসিতা ও

চরিত্রহীনতায় রোমক জাতির মান-সম্ভ্রম যেতে বসেছে জগতের জাতিসমূহের সম্মুখে। রোমক শাসকত্রয়ের একজন হিসাবে এর প্রতিবাদ করতে সীজার বাধ্য।

দূতের মুখে সব শুনে অ্যাণ্টনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁর আচরণে প্রতিবাদ করবার অধিকার সীজারকে কে দিল? সীজারকে বালক বোকা প্রভৃতি বলে অপমান করলেন অ্যাণ্টনি, সীজারের দূতেরই সম্মুখে। দূত মাথা নীচু করে রোমে ফিরে গেল।

একটা কলহ আসন্ন মনে করে সীজার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিছুই অস্বাভাবিক নয়, নূতনও নয়। এর আগেও ত্রয়ীর শাসন ছিল রোম সাম্রাজ্যে, ত্রয়ীর ভিতর যুদ্ধও বেধেছিল। অক্টেভিয়াসেরই মামা জুলিয়াস সীজার জয়ী হয়েছিলেন সে যুদ্ধে। এবারও যদি যুদ্ধ হয়, অক্টেভিয়াস সীজারকে জিততে হবেই, বজায় রাখতে হবেই সীজার নামের মর্যাদা।

সীজার যুদ্ধের তোড়জোড় করুন,—এদিকে অন্য কারণে চঞ্চল হয়ে উঠলেন অ্যাণ্টনি।

সিসিলিতে জ্বলেছে অশান্তির আগুন।

জুলিয়াস সীজারেরও পূর্বে পম্পী ছিলেন রোমের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁরই পুত্র তরুণ পম্পী সিসিলিতে বিদ্রোহের পতাকা তুলে বসেছে। ভূমধ্যসাগরের জলদস্যুরা যোগ দিয়েছে তরুণ পম্পীর সঙ্গে। নৌযুদ্ধে এই দস্যুরা অজেয়। কাজেই পম্পীর বিদ্রোহ সারা রোম সাম্রাজ্যের পক্ষেই একটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এ অবস্থায় অ্যাণ্টনি নীরব থাকতে পারেন না। পম্পী জয়ী হলে সাম্রাজ্যই ভেঙে যাবে। আবার একক সীজারের হাতে পম্পী যদি হেরে যান, অ্যাণ্টনির চাইতেও সীজারের বীরত্বের খ্যাতি বেশী ছড়িয়ে পড়বে দেশবিদেশে। এই দুটোর কোনটাকেই ঘটতে দেওয়া সম্ভব নয় অ্যাণ্টনির পক্ষে।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাধ্য হয়ে আসতে হল রোমে। পম্পীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ তাঁকে নিতেই হবে।

রোমে আসতেই সীজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কে কার কতখানি

ক্ষতি করেছে, শুরু হল তারই হিসাবনিকাশ। গোড়াতেই একটা কলহের সূচনা।

এ-কলহ মিটিয়ে দিলেন লেপিডাস। এ-লোকটি অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোক। সীজার বা অ্যান্টনি—কারও প্রতিই এঁর হিংসা বা রাগ নেই। তিন জনে মিলে মিশে রোম সাম্রাজ্য ভোগ করবেন—এই হল তাঁর বাসনা। এ-তিনজনের ভিতর বিবাদ ঘটলে তিনজনেরই ক্ষতি হবে, সেটা চান না লেপিডাস।

অ্যান্টনি ও সিজারের বিবাদ গোড়াতেই মিটিয়ে দেবার জন্য তিনি প্রস্তাব করলেন যে সীজারের ভগ্নী অক্টেভিয়ার সঙ্গে অ্যান্টনির বিবাহ হোক। আত্মীয়তা হলে পরে রেষারেষি আর থাকবে না! দুই ভাইয়ের মত সীজার ও অ্যান্টনি চিরদিন মিলে মিশে কাজ করবেন।

মনের মিলটা জোরালো করার প্রয়োজন তাঁরাও দুজনে বুঝতে পেরেছেন। লেপিডাসের প্রস্তাবে সীজার সায় দিলেন; অ্যান্টনিও আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কাজেই, অতি শীঘ্রই অক্টেভিয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল অ্যান্টনির। গ্রীসের এথেন্স নগরে অ্যান্টনির ছিল এক মনোরম প্রাসাদ। স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গেলেন সেখানে।

পম্পীর সঙ্গে এর আগেই একটা সন্ধি হয়ে গিয়েছে।

ইতালীতে অক্টেভিয়াস, গ্রীসে অ্যান্টনি। সরু এক ফালি জল, আড্রিয়াটিক সাগর, তার এপারে একজন, ওপারে আর একজন। দুই মহাশক্তিমান প্রতিবেশীর ভিতর শান্তি কতদিন থাকতে পারে? তুচ্ছ বিষয় নিয়ে রেষারেষি শুরু হল। রেষারেষি থেকে ক্রমে আবার কলহের সূচনা দেখা দিল। এনোবার্বাস অ্যান্টনিকে বলে—"সীজার তোমার সর্বনাশ করতে চাইছেন।" ওদিকে অ্যাগ্রিপা বলে অক্টেভিয়াসকে—"দেখছেন কী? অ্যান্টনির সৈন্য যে তৈরী; ওরা এল বলে!"

অক্টেভিয়া বুদ্ধিমতী। তিনি দেখলেন—তাঁর স্বামী ও ভ্রাতার মধ্যে একটা যুদ্ধ বেধে উঠবার মত হয়েছে। তিনি স্বামীকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অ্যান্টনি চতুর লোক, তাঁর দিক্ থেকে যে

অন্যায় কিছু করা হয়নি, অক্টেভিয়াকে তা বোঝাতে বিশেষ বেগ পেতে হল না তাঁকে। তাঁর কথা হল এই যে, দোষ যা কিছু তা সীজারের। অক্টেভিয়াকে তিনি পরামর্শ দিলেন—"তোমার উচিত রোমে গিয়ে এখুনি তোমার ভাইকে শান্ত করা। তিনি যদি আমায় আক্রমণ করেন, আমার তো যুদ্ধ না করে গতি থাকবে না!"

অক্টেভিয়া সরল মনে স্বামীর কথা বিশ্বাস করলেন। ভাইকে বোঝাবার জন্য সামান্য কয়েকজন সৈনিক ও সহচরী নিয়ে যাত্রা করলেন রোমে।

তিনিও বিদায় হলেন, আর এদিকে অ্যাণ্টনিও এথেন্স ত্যাগ করলেন। চললেন আলেকজান্দ্রিয়া! ক্লিওপেট্রার জন্য তাঁর অন্তর তখন আকুলিবিকুলি করছিল।

অ্যাণ্টনি যত চালাকিই করুন, এ খবর সীজারের কানে উঠলো ঠিকই। তিনি গর্জন করে উঠলেন—দুঃখে রাগে অভিমানে! তাঁর ভগ্নীকে ফাঁকি দিয়ে রোমে পাঠানো, আর তার পরেই ক্লিওপেট্রার কাছে ফিরে যাওয়া—এটাকে তিনি নিজেরই অপমান বলে মনে করলেন। তখুনি স্থির করলেন—অ্যাণ্টনিকে এর জন্য উচিত সাজা দিতে হবে।

কিন্তু অ্যাণ্টনি দুর্বল নন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সেনাপতি তখন তিনি। তাঁর সৈন্য যে কত, তার লেখাজোখা নেই। পাথিয়া, সীরিয়া, ব্যাকট্রিয়া, মিসর—সব তাঁর হাতের মুঠোয়। দুনিয়ার সবচেয়ে ধনী দেশগুলি তাঁর অধিকারে। তাঁকে ঘাঁটানো সহজ ব্যাপার নয়।

সীজার নিজের বল বাড়াতে লাগলেন।

প্রথমে ভালোমানুষ লেপিডাসকে বিতাড়িত করে তিনি তাঁর অধিকৃত রাজ্যগুলি নিজের শাসনে এনে ফেললেন। তিনজনের শাসন ছিল পৃথিবীতে; এখন হল দুইজনের শাসন। এদিকে সীজার, ওদিকে অ্যাণ্টনি। রোমক জগতের মালিক হওয়ার জন্য দুজন মাত্র প্রতিযোগী।

লেপিডাসকে তাড়িয়ে দেওয়াতে খুশী হতে পারলেন না অ্যাণ্টনি। প্রতিবাদ করলেন সীজারের কাছে। সীজার তার কড়া

উত্তর দিলেন। রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেক কি অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার পায়ে বিকিয়ে দেননি? তিনি কোন্ মুখে তিরস্কার করতে আসেন সীজারকে?

এরপর যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় কি?

ভূমধ্যসাগরের জলদস্যুদের পরাজিত করে সীজার দখল করে নিয়েছেন তাদের জাহাজগুলি, নিজের নৌশক্তি অনেকখানি বৃদ্ধি করে নিয়েছেন এইভাবে। ভূমধ্যসাগর পেরুতে আর তাঁর অসুবিধা নেই, সৈন্য নিয়ে তিনি মিসরের উপকূলে উপনীত হলেন।

অ্যান্টনিও সৈন্য সাজালেন। ক্লিওপেট্রার নৌবাহিনীও প্রবল, তারই উপর ভরসা করে সমুদ্রের ভিতরই সীজারকে বাধা দিতে অগ্রসর হলেন তিনি।

ক্লিওপেট্রার আজ বড় আনন্দ। অ্যান্টনির বীরত্বের উপর তাঁর অটুট বিশ্বাস। সামনাসামনি যুদ্ধ হলে সীজার যে নিশ্চয়ই হেরে যাবেন, এতে একটুও সন্দেহ তাঁর নেই। এইবার অ্যান্টনির বামে বসে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরী হবেন তিনি। আনন্দে এমন অধীর হয়ে উঠলেন তিনি যে নিজের চোখে যুদ্ধ দেখতে যাওয়ার জন্য তৈরী হলেন।

এতে কিন্তু আপত্তি করলেন এনোবার্বাস ও অন্য সেনাপতিরা। তাঁরা বোঝাতে চাইলেন যে যুদ্ধের সময় নারীরা উপস্থিত থাকলে নানা কারণেই অসুবিধা ঘটে। কিন্তু ক্লিওপেট্রার ইচ্ছায় বাধা দেবে কে? তাঁর কথাই অ্যান্টনির কাছে আইন। স্থির হল যে নিজের জাহাজে করেই ক্লিওপেট্রা যাবেন, যুদ্ধজাহাজের বহর ঘিরে থাকবে তাঁকে।

অ্যাক্টিয়াম। তারই অল্প দূরে দুই পক্ষের নৌবাহিনী সামনা-সামনি এসে দাঁড়াল। সমুদ্রজল ছেয়ে গেল জাহাজে আর জাহাজে। রোদে ঝলমল করছে মিসরের আকাশ, সেই আকাশে পতপত করে উড়ছে নানা বর্ণের পতাকা। নানা বাজনার তুমুল শব্দে দশদিক হয়েছে পরিপূর্ণ। উভয় সেনার জয়ধ্বনি পরস্পরকে ছাপিয়ে উঠতে চাইছে। অলিম্পাস পাহাড়ের মাথায় বসে দেবতারাও যেন ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছেন সেই ভীষণ শব্দ শুনে।

যুদ্ধ শুরু হল।

রোমক সৈন্যের বাহাদুরি ডাঙ্গার যুদ্ধেই। অ্যাণ্টনি যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি বলে গণ্য হয়েছেন আজ, সেও স্থলযুদ্ধে বার বার জয়লাভ করার দরুনই। সীজার বা অ্যাণ্টনি—কারোরই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাবার নেই জলযুদ্ধে। তবু জলদস্যুদের সাহায্য লাভ করে সীজার ইদানীং নিজের নৌশক্তি খানিকটা বাড়িয়ে তুলতে পেরেছেন। অ্যাণ্টনির সহায় হল মিসরীয় নৌসেনা, জলযুদ্ধে তাদের খুবই নাম ছিল একসময়ে, কিন্তু তারা যুদ্ধের অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছে বিলাসী ক্লিওপেট্রার আমলে।

তবু অ্যাণ্টনির একটা নিজস্ব প্রতিভা আছে, আছে সৈনাপত্যের কৌশল, সবকিছুর উপরে আছে সৈনিক-সেনাপতিদের আস্থা। তাই সীজারের অধীনস্থ অজেয় জলদস্যুরাও অ্যাণ্টনির সম্মুখে বার বার হটে যাচ্ছে। অ্যাণ্টনির জয়ের আশা প্রতিমুহূর্তে বেড়েই চলেছে।

অ্যাণ্টনির পাশে পাশেই চলেছে ক্লিওপেট্রার জাহাজ।

হঠাৎ কী হল—কে জানে, বেজায় ভয় পেয়ে একেবারে আকুল দিশাহারা হয়ে পড়লেন ক্লিওপেট্রা! ফলাফল বিবেচনা না করে নিজের জাহাজের অধ্যক্ষকে তিনি আদেশ দিলেন—"জাহাজ ফেরাও; আমরা পিছনে থেকে যুদ্ধ দেখব।"

রানীর আদেশ অগ্রাহ্য করবার সাহস অধ্যক্ষের নেই; ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাঁকে জাহাজ ফেরাতেই হল।

তুমুল যুদ্ধের মাঝখানে অ্যাণ্টনির চোখে পড়ল—ক্লিওপেট্রার জাহাজ পালিয়ে যাচ্ছে তাঁর পাশ থেকে।

বেশী ভালবাসলে মানুষের মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দুর্বল মনে ভয় ঢোকে অতি সহজেই, আর ভয় যার মনে ঢোকে তার আর মাথার ঠিক থাকে না। অ্যাণ্টনির ভয় হল—ক্লিওপেট্রা হয়ত আহত হয়েছেন, হয়ত দূর-থেকে নিক্ষিপ্ত কোন অস্ত্র তাঁর বুকেই বিঁধে গিয়েছে। হয়ত এতক্ষণ তিনি মৃত্যুশয্যায় আছাড়িবিছাড়ি করছেন আর মৃত্যুর মুখে পড়ে হয়ত প্রিয় অ্যাণ্টনির নামই তিনি বারংবার উচ্চারণ করছেন, একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য।

মতিচ্ছন্ন হয়ে অ্যান্টনি যুদ্ধের কথা, নিজের ভবিষ্যতের কথা, এতগুলি সৈনিক-সেনাপতির ভাগ্যে কী ঘটবে—সে কথা সব ভুলে গেলেন। চীৎকার করে উঠলেন—"অধ্যক্ষ, জাহাজ ঘোরাও, ক্লিওপেট্রার জাহাজের সঙ্গে চল। আমি দেখব, কী হল তাঁর—"

স্বয়ং সম্রাটের আদেশ! নিরুপায় পোতাধ্যক্ষ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জাহাজ ঘোরাতে বাধ্য হল।

আর অ্যান্টনির বাহিনী?

তারা স্বচক্ষে দেখল—তাদের সেনাপতি, তাদের সম্রাট অকস্মাৎ জাহাজ ঘুরিয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। নিশ্চয়ই যুদ্ধে পরাজয় অনিবার্য দেখেই পালাচ্ছেন।

সেকালের যুদ্ধ—সে ছিল রাজায়-রাজায় যুদ্ধ। রাজার প্রয়োজনে প্রজারা যুদ্ধ করত। রাজা মরলে বা পালিয়ে গেলে বা বন্দী হলে সঙ্গে সঙ্গে তারা যুদ্ধ বন্ধ করত। দেশপ্রেমের তাগিদ তাদের ছিল না। যে বেতন দিচ্ছে, তার জন্যই তারা যুদ্ধ করবে। তা নইলে তাদের কাছে অ্যান্টনিও যা সীজারও তাই। তাই অ্যান্টনিকে পালাতে দেখে তাঁর সৈন্যেরাও পালাতে শুরু করল। যুদ্ধে যাঁর কোনদিন পরাজয় ঘটেনি, মিসরী মায়াবিনীর মোহে পড়ে আজ হল তার প্রথম ও চূড়ান্ত পরাজয়।

আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে গেলেন অ্যান্টনি। ক্লিওপেট্রাকে নিরাপদ, অক্ষত দেখে প্রথমে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন একটা, তারপরে অকারণে যুদ্ধ ত্যাগ করে আসবার জন্য ক্লিওপেট্রার উপর হলেন ক্রুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ, পালিয়ে এসে নিজের সর্বনাশ নিজে করেছেন—তার জন্য নিদারুণ লজ্জা। "এ আমি কি করলাম? জয় এসে গিয়েছিল হাতের নাগালের ভিতর, তাকে পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করলাম?" পরিতাপের আর শেষ নেই অ্যান্টনির।

কিন্তু পরিতাপে তো কোন ফল নেই! সেনাপতিরা দোমনা, সৈনিকদের মনে নেই উৎসাহ। যে সম্মান অ্যান্টনি হারিয়েছেন, আবার এক্ষুনি তা উদ্ধার করতে না পারলে অ্যান্টনির সর্বনাশ আসন্ন।

নতুন যুদ্ধ জয় করে অ্যাণ্টনি পরাজয়ের লজ্জা মুছে ফেলবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

সীজার চতুর! যুদ্ধ জয় করেই তিনি চুপচাপ বসে নেই। ইতিমধ্যে তিনি দূত পাঠিয়েছেন ক্লিওপেট্রার কাছে। দূত এসে ক্লিওপেট্রাকে বোঝাচ্ছে—অ্যাণ্টনির সঙ্গ ত্যাগ করাই এখন তাঁর উচিত। সীজারের পক্ষ থেকে অনেক আশা তাঁকে দেওয়া হয়েছে —অ্যাণ্টনিকে যদি ধরিয়ে দেন ক্লিওপেট্রা, সীজারের অনুগ্রহে পরম সুখে রাজত্ব করতে পারবেন তিনি। এমন কি, তাঁর রাজ্যের আয়তন বেড়েও যাবে হয়ত।

ক্লিওপেট্রা এ-প্রলোভনের কি উত্তর দেবেন, তা স্থির করতে পারলেন না হঠাৎ। স্থির করবার সুযোগও আর রইল না তাঁর। অ্যাণ্টনি এসে নিজের কানে শুনতে পেলেন দূতের মিষ্ট মধুর সব কথা। রাগের মাথায় রাজসভার আদবকায়দা ভুলে গেলেন তিনি। সৈনিকদের ডেকে আদেশ করলেন—"সীজারের দূতকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বেত মেরে বিদায় করে দাও।"

আদেশ পালিত হল। সারা দেহে বেতের দাগ নিয়ে হতভাগ্য দূত সীজারের কাছে ফিরে গেল।

ক্রুদ্ধ সীজার আবার সৈন্য সাজাতে শুরু করলেন। অ্যাণ্টনিও প্রস্তুত হতে লাগলেন।

কিন্তু অ্যাণ্টনির আগের সমস্ত কীর্তি ডুবে গিয়েছে অ্যাক্‌টিয়ামের শোচনীয় পরাজয়ে। সীরিয়া, ব্যাক্‌ট্রিয়া, পার্থিয়ার রাজারা তাঁর দল ছেড়ে গিয়েছেন। যাঁরা ছিলেন অ্যাণ্টনির হুকুমের চাকর, তাঁরা আজ দূরে সরে গিয়ে ঘটনার স্রোত লক্ষ্য করছেন, দেখা যাক কী হয়। অনেক সৈন্যক্ষয় হয়েছে অ্যাণ্টনির। ওদিকে সীজারের শক্তি গিয়েছে বেড়ে। লেপিডাসের সৈন্য-সেনাপতিরা তো বটেই, অ্যাণ্টনির সেনাপতিরাও অনেকে পালিয়ে গিয়ে সীজারের দলভুক্ত হয়েছে। এমন কি, অ্যাণ্টনির ডান হাতের মত যে এনোবার্বাস, সেও একদিন রাত্রি-যোগে পালিয়ে চলে গেল শত্রুর শিবিরে। সীজার তাকে গ্রহণ করলেন বটে, কিন্তু না করলেন সমাদর, না দিলেন কোন কাজের

ভার। বিশ্বাসঘাতকদের দলে টেনে নিতে হয় বটে, কিন্তু তারা যে নতুন বিশ্বাসের যোগ্য নয়, সে-কথা রাজারা ভোলেন না।

এনোবার্বাস পালিয়েছে শুনে হাস্য করলেন অ্যাণ্টনি। মানুষ এত নীচ? অ্যাণ্টনি তাকে কী দিতে বাকী রেখেছেন? তার চেয়ে বেশী কী আর সে প্রত্যাশা করে সীজারের কাছে? হয়ত সে ভেবেছে অ্যাণ্টনির দলে থাকলে জীবনটাই যাবে। সেই জীবনই বুঝি সে বাঁচাতে চায় সীজারের আশ্রয় নিয়ে? আরে মূর্খ! পৃথিবীই যখন ভেঙে দু-খান হয়ে যেতে বসেছে, তখন তোর নিজের জীবন বাঁচানোই কি একটা বৃহৎ জিনিস হল? এনোবার্বাসকে কৃপার পাত্র মনে করলেন অ্যাণ্টনি। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে নিজের ধনৈশ্বর্য পিছনে ফেলেই চলে গিয়েছিল এনোবার্বাস। অ্যাণ্টনি সে-সমস্ত সীজারের শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন—সঙ্গে দিলেন ছোট্ট একটুখানি চিঠি—"আর কোনদিন যেন তোমায় প্রভু-বদল করতে না হয়।"

অবশেষে এল যুদ্ধের দিন।

স্থলে জলে একসাথে যুদ্ধ। স্থলযুদ্ধে অ্যাণ্টনির মত সেনাপতি আর নেই, কে তাঁকে হারাবে? সীজারের বৃহৎ বাহিনী লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল তাঁর সম্মুখে।

কিন্তু সীজার শোধ তুললেন জলযুদ্ধে। একে তাঁর নৌশক্তি প্রবল, তায় আবার মিসরীয় নৌবাহিনী যুদ্ধকালে অ্যাণ্টনিকে ত্যাগ করে সীজারের দলে ভিড়ল। হয়ত তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে ক্লিওপেট্রারই ইঙ্গিত ছিল, কিংবা হয়ত ক্লিওপেট্রার সেনাপতিরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করবার জন্য রানীকে জিজ্ঞাসা না করেই একাজ করেছিল।

কারণ যা-ই হোক, তাদের এই নীচতায় সর্বনাশ হল অ্যাণ্টনির। স্থলযুদ্ধে যে সাফল্য তিনি পেলেন, তা অতলে তলিয়ে গেল সমুদ্রের জলে। ভাগ্যলক্ষ্মী অ্যাণ্টনিকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে গেলেন।

সীজার আদেশ প্রচার করেছেন—অ্যাণ্টনিকে জীবিত বন্দী করতে হবে। কিন্তু এ-পুরুষসিংহকে জালবদ্ধ করবার মত সাহসী শিকারী তিনি কোথায় পাবেন?

অ্যাণ্টনি তাঁর এক সৈনিককে আদেশ করলেন—"আমার বুকে তুমি তরবারি বিঁধিয়ে দাও।"

সৈনিক চোখের জল ফেলে নিবেদন করল—"এ নিষ্ঠুর কাজ আমি করতে পারব না প্রভু!"

কঠিন কণ্ঠে প্রভু বললেন—"তুমি ছিলে আমার ক্রীতদাস। আমি তোমায় স্বাধীন করে দিয়েছিলাম একটি শর্তে, মনে পড়ে?"

সৈনিক নতশির, নীরব।

"সে-শর্ত এই যে—প্রয়োজন ঘটলে আমায় হত্যা করে তুমি অপমানের হাত থেকে আমায় রক্ষা করবে! আজ তোমার সে প্রতিশ্রুতি তুমি পালন কর।"

সৈনিক তখন নিজের বুকে তরবারি বিঁধিয়ে দিয়ে এই উভয়-সংকট থেকে উদ্ধার পেল। ঠাণ্ডা মাথায় প্রিয়তম প্রভুর বুকে তরোয়াল বসানোর চাইতে নিজের বুকে বসানো অনেক সোজা।

তা দেখে অ্যাণ্টনি বললেন—"তোমার দৃষ্টান্তই অনুসরণ করব আমি। আমিও আত্মহত্যা করব।"—নিজের হাতে তরবারি বসিয়ে দিলেন বক্ষে।

কিন্তু মৃত্যুও বুঝি অ্যাণ্টনির প্রতি বিরূপ। সহসা সে এল না। এদিকে অ্যাণ্টনির অবশিষ্ট সৈনিকেরা প্রভুর সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে এসে দেখতে পেল—তাঁর দেহ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মৃত্যুর আর দেরি নেই। তখন তাঁরা তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে চলল আলেক-জান্দ্রিয়ার প্রাসাদে।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তখনও অ্যাণ্টনির একমাত্র কামনা—মৃত্যুর পূর্বে আর একবার ক্লিওপেট্রাকে দর্শন করবেন। হোক সে অবিশ্বাসিনী তবু অ্যাণ্টনি তাঁকে ভালবেসেছিলেন। বীরের প্রেম ক্ষয় হয় না, বদলায় না, মরে না। অ্যাণ্টনির ভালবাসা অমর।

কিন্তু ক্লিওপেট্রা প্রাসাদে নেই—সীজারের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এক মন্দির-চূড়ায়। অ্যাণ্টনিকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা হল শেষবারের মত।

"সীজারকে বিশ্বাস কোরো না"—ক্লিওপেট্রাকে এই শেষ উপদেশ দিয়ে অ্যাণ্টনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সীজার এলেন—অনেক মিষ্টি কথা বললেন—অনেক আশা-ভরসা দিলেন ভবিষ্যতের জন্য। তারপর ক্লিওপেট্রার চারদিকে পাহারা বসিয়ে নিজের শিবিরে চলে গেলেন। তখন সীজারেরই এক সেনাপতি গোপনে ক্লিওপেট্রাকে জানালেন—"তোমায় বন্দিনী করে রোমে নিয়ে যাওয়াই সীজারের অভিপ্রায়। রথের চাকার সাথে বন্দী রাজাদের বেঁধে নিয়ে রোমের সেনাপতিরা রোমে প্রবেশ করে। জানো না সে কথা?"

সে অপমান, সে লজ্জার কল্পনাও সইতে পারেন না ক্লিওপেট্রা, তার চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয়? জয়গৌরবে যার জীবন কেটেছে, সে আজ অপমান সইবার জন্য বেঁচে থাকবে কেন? তাঁর আদেশে এক ধীবর একটি ঝুড়িতে করে একরাশি ফল নিয়ে এল। সেই ফলের নীচে কতিপয় বিষধর সাপ। নীলনদের কর্দমে অতি ছোট আকারে একরকম সাপ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের দংশনে যাতনা নেই, কিন্তু তাদের বিষ এত তীব্র যে চোখের পলকে মানুষের মৃত্যু ঘটে।

তখন হীরা মণিমুক্তায় মোহিনী বেশে সেজে জগতের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ক্লিওপেট্রা রাজশয্যায় শয়ন করলেন সেই মন্দিরচূড়ায়, তারপর বুকের উপর তুলে নিলেন সেই সাপ।

শেষ হল ক্লিওপেট্রার জীবন-নাট্যের অভিনয়, নেমে এল মরণের কালো পর্দা।

জুলিয়াস সীজার

রোম!

পৃথিবীর অর্ধেকটা জুড়ে যার অধিকার বিস্তৃত, সেই মহানগরী রোম!

দুই হাজার বছর ধরে যার সৈনিকেরা আফ্রিকা-ইউরোপ-পশ্চিম এশিয়ার দেশে দেশে অতুল বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ চালিয়েছে আর রাজ্যের পর রাজ্য গড়ে তুলেছে, সেই রোম।

যে নগরীর প্রতিটি সন্তানই বীর, যে নগরীর গৌরব বহু বহু যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পরেও আজও মানুষ ভুলতে পারেনি, সেই রোম!

রোমক সৈন্য যখন অরণ্যে প্রবেশ করেছে, তখন সেখানে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ জনপদ; রোমকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গথ, ভিজি-গথ, ফ্রাঙ্ক, ব্রিটন প্রভৃতি জাতিরা একে একে অসভ্যতার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে সভ্যতার আলোকে। রোমের বিজয়ী সেনা-পতিরা দিকে দিকে সম্মান পেয়েছেন মহামানব বলে।

যুগে যুগে নব নব কীর্তি স্থাপন করেছেন পৃথিবীজয়ী সেনাপতিরা —সিপিও, সুলা, পম্পী। রোমের একমাত্র ভাগ্যবিধাতা বলে পম্পীর গৌরব সেদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

কিন্তু আজ—

আজ তাঁর পতন ঘটেছে। অন্য এক মহাশক্তিমান পুরুষের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষায় পরাজয় ঘটেছে তাঁর। আজ আর তাঁর নাম কেউ করে না। নতুন যিনি ক্ষমতা লাভ করেছেন, তাঁকে খুশী করবার দিকেই দৃষ্টি সবাইয়ের।

সেই নতুন মহাশক্তিমান পুরুষ, নতুন যিনি ক্ষমতা লাভ করেছেন রোমের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যে, তাঁর নাম জুলিয়াস সীজার।

প্রাচীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের ভিতর একজন এই জুলিয়াস সীজার। সাহসে বীরত্বে আর সৈন্য চালনার কৌশলে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তেমনি আবার একদিকে সাহিত্যরচনায়, অন্যদিকে দেশের সুশাসনের জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলা আর নতুন নতুন আইন রচনার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অতুলনীয়।

বহু বৎসর বিদেশে বাস করবার পরে এই জুলিয়াস সীজার সেদিন ফিরে আসছেন রোমে। গল ও ব্রিটন দেশে রোমক শাসন পাকাপাকিভাবে প্রতিষ্ঠা করে পম্পীর বিরোধিতা গুঁড়িয়ে দিয়ে বিজয়ীর গৌরব নিয়ে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন রোমের সিংহদ্বারে।

মহানগরীর মানুষেরা দলে দলে ছুটে চলেছে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসবার জন্য। সীজারের নামে জয়ধ্বনি করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে তারা। তাঁর যশ আর কীর্তির কথা বলাবলি করে রোমের নাগরিকেরা নিজেরাই আনন্দবোধ করছে। সীজারও রোমক তারাও রোমক, সীজার একান্তভাবে তাদেরই।

সবাইয়ের মনের কথা কিন্তু তা নয়। বিরোধী দলও আছে।

আছে, কিন্তু সংখ্যায় তারা একান্তই কম। দুই শ্রেণীর লোক সীজারের উন্নতি দেখে খুশী হতে পারেনি। পম্পীর দলের লোক তখনও কিছু রয়েছে রোমে। তারা সীজারকে শত্রু বিবেচনা করছে। আর রয়েছেন রোমের মাথাওয়ালা কতিপয় পুরুষ, যাঁদের চিরদিনের নীতি হল এই যে, কোন একজন লোকের হাতে সকল ক্ষমতা একত্র হওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

আকাশে যখন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, নক্ষত্রগুলি কারও চোখে পড়ে

না। এই ধরনের রোমক নেতাদের এখন সেই দশা। তাঁরা মনে করেন, ভাগ্য ভাল হলে তাঁরাও সীজারের মতই কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন। তাঁরা ভাবেন, সবাইকে পিছনে হটিয়ে দিয়ে নিজের হাতে সব গৌরব একত্র করা অনুচিত হয়েছে সীজারের।

জনতা ছুটেছে সীজারকে দেখতে; কেবল দুটি বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন রাজপথের পাশে—ফ্লেভিয়াস আর মেরুলাস। সরকারী লোক এঁরা দুজনেই, পদবী এঁদের ট্রিবিউন, গরীব রোমকদের প্রতিনিধি এঁরা। রোমের আইন-অনুযায়ী এঁরা কিছু ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

জনতাকে ডেকে ফিরিয়ে তিরস্কার করছেন এঁরা।

"কোথায় চলেছ তোমরা?"

কেউ-একজন উত্তর দিল—"সীজারকে দেখতে! সীজারকে সম্মান দেখাতে।"

"সম্মান?"—ট্রিবিউন চেঁচিয়ে উঠলেন—"পম্পীকে পরাজিত করে এসেছেন বলে সম্মান? পম্পী কি ছিলেন রোমের শত্রু? এই তো সেদিন পর্যন্ত পম্পীকে একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য তোমরা দলে দলে এইরকমই রাজপথে ভিড় করতে—দেয়ালের মাথায়, ঘরের ছাদে, জানালার আলিসায় উঠে বসতে—পম্পীর নামে জয়ধ্বনি তুলবার জন্য! কারও কোলে শিশু, কারও হাতে ফুল—তোমাদের আমি সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি পম্পীর দর্শনের আশায়। আর আজ? সবই উলটে গেল? সেদিনের পূজার পাত্র পম্পীকে ভুলে গিয়ে সেই পম্পীর শত্রু, সেই পম্পীর হত্যাকারীকে সম্মান দেখাবার জন্য সেই তোমরাই আজ ছুটে বেরিয়েছ কাজকর্ম ফেলে?

মনে পড়ে সেদিনের কথা? পম্পীর রথ রাজপথে দেখামাত্র লক্ষ কণ্ঠে যে চিৎকার তোমরা তুলতে, তাতে টাইবারের বুকে ঢেউ উঠত আথালপাথাল হয়ে। আর আজ তোমরাই এসেছ—উৎসবের বেশে সেজে, কাজ থেকে ছুটি নিয়ে, ফুল ছড়িয়ে দেবার জন্য তারই আগমন পথে যে এসে রোমে প্রবেশ করছে সেই পম্পীর রক্তই দুই হাতে

মেখে ? ধিক্! উপকারীকে ভুলে যাওয়ার এই যে মহাপাপ, এর প্রায়শ্চিত্ত কী ? যাও, ঘরে ফিরে যাও তোমরা! নতজানু হয়ে দেবতাদের কাছে ক্ষমা চাও গিয়ে। তা নইলে তাঁদের রোষে মড়ক এসে ধ্বংস করে দেবে তোমাদের সাধের রোম!"

এ-বাক্যবাণ সইতে পারে না জনতা। তারা একে একে ট্রিবিউন-দের সমুখ থেকে পালিয়ে গেল। সত্য কথা বলতে কি, পম্পী বা সীজার কারও জন্যই এসব লোকের মাথাব্যথা নেই। যে-যখন উঠতির পথে, তারই তখন জয়ধ্বনি করে এরা। পম্পীকেও একদিন সম্মান জানিয়েছে, সীজারকেও আজ জানাতে চাইছে। এতে তাদের অপরাধ কোথায় আছে, তা তারা বুঝতে পারে না। তবু ট্রিবিউনরা তাদেরই প্রতিনিধি ও ম্যাজিস্ট্রেট, তাদের কথার অবাধ্য ওরা হতে পারে না। আনন্দোৎসবে যোগ দিতে না পেরে দুঃখিত হয়েই তারা গৃহে ফিরে গেল।

ফ্লেভিয়াস খুশীর হাসি হাসলেন সহকারীর দিকে তাকিয়ে।

"সীজার বড়ই বেড়ে উঠেছে। ওকে সংযত করা দরকার। জনতা যাতে ওকে অযথা বাড়িয়ে না দেয়, তাই করতে হবে আমাদের। তা নইলে, দেখতে দেখতে এত উঁচুতে ও উঠে যাবে ওর নাগাল আর পাবে না কেউ।"

সীজার এই সময় নিকটেই এসে পড়েছেন, রাজপথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসছেন এই দিকেই। তাঁর আশে-পাশে সেনাপতি, বক্তা, রাজনীতির পণ্ডিত—রোমের প্রধান পুরুষেরা সবাই রয়েছেন। আরও আছেন সীজারের পত্নী কালফর্নিয়া এবং সীজারের বন্ধু ব্রুটাসের পত্নী পোর্সিয়া!

চারদিকে হাজার হাজার মানুষের ভিড়।

হঠাৎ শোনা গেল একটি স্বর—"সীজার!"

"কে ? কে ডাকে আমায় ?"—বলে উঠলেন সীজার।

সেই স্বর আবার বলল—"মার্চের মাঝামাঝি! সাবধান!"

"কে ? কে ও ?"—সীজার প্রশ্ন করলেন।

ব্রুটাস জানালেন—"ও একজন দৈবজ্ঞ। আপনাকে বলছে—মার্চের মাঝামাঝি অর্থাৎ পনেরোই তারিখটা সাবধানে থাকবেন।"

সীজার বললেন—"দেখি! দেখি লোকটাকে!"

দৈবজ্ঞকে এনে দাঁড় করানো হল সীজারের সমুখে।

সীজার এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—"ওঃ স্বপ্ন দেখছে লোকটা। চল, এগিয়ে যাই!"

সীজারের সঙ্গে সঙ্গে নেতা এবং জনতা—সবাই এগিয়ে গেল রাজ-পথ ধরে। গেলেন না শুধু দুই ব্যক্তি। তাঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন রাস্তায়।

তাঁরা ব্রুটাস ও কেসিয়াস।

রোমে ছেলে বুড়ো স্ত্রীপুরুষ সবাই শ্রদ্ধা করে ব্রুটাসকে।

কেসিয়াসকেও সবাই জানে উঁচুদরের সেনাপতি বলে।

ব্রুটাসকে দাঁড়াতে দেখেই কেসিয়াসও দাঁড়িয়েছেন। "তুমি যাবে উৎসব দেখতে, ব্রুটাস?—"

"না।"

"কেন, যাও না! খেলা-ধূলো আমোদ-প্রমোদ—"

"ও-সব ভাল লাগে—ঐ অ্যান্টনির মত লোকের। আমি ও-ধাতু দিয়ে তৈরী নই। তা, তুমি যাও না। আমি যাচ্ছি না বলে তোমার যাওয়া বন্ধ হবে কেন?"

কেসিয়াস হঠাৎ গলার সুরে একটা কাতরতা ফুটিয়ে তুললেন। "ব্রুটাস! আগের মত আমার উপর আর তোমার ভালবাসা দেখতে পাইনে। সদাই গম্ভীর হয়ে থাক—আমায় দেখলে।"

"তোমায় দেখলে?"—ব্রুটাস চমকে উঠলেন—"না, না, বন্ধু! তোমাকে দেখার সঙ্গে আমার গম্ভীর হওয়ার কোন সম্বন্ধ নেই। আমার নিজের অন্তরে চলেছে একটা দোটানা, সদাই অন্য কথা ভাবি, বন্ধুদের দেখলে তাঁদের প্রতি যে ভদ্রতা দেখানো প্রয়োজন, তা মনে থাকে না।"

অন্তরে দোটানা? কেসিয়াস কান খাড়া করে উঠলেন। যেকথা ব্রুটাসের কাছে তুলতে চান, আপনা থেকেই তার পথ খুলে দিয়েছেন ব্রুটাস! তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—"ব্রুটাস! তুমি নিজের মুখ নিজে দেখতে পাও?"

সীজার যেদিকে তাকান, সেই দিকেই উদ্যত ছুরিকা। পূর্বে যারা ছিল তাঁর
অনুগত পার্শ্বচর তারাই এই মুহূর্তে হয়েছে আততায়ী ঘাতক।
এমন কি ব্রুটাসও!

ব্রুটাসের হাসি পেল। "আয়না না হলে—"

"ঠিক!" কেসিয়াস সোৎসাহে বললেন—"ঠিক! আয়না! তোমার আয়না নেই। রোমের যাবতীয় লোক আক্ষেপ করে—মহান্ ব্রুটাসের আয়না নেই। নিজেকে নিজে দেখতে পান না তিনি। অথচ—নিজের মুখ দেখতে পাওয়া, নিজের ক্ষমতার বিষয়ে সজাগ হয়ে ওঠা—ব্রুটাসের যে আজ কত প্রয়োজন, তা বলে শেষ করা যায় না।"

ব্রুটাসের মনে সন্দেহ ঘনিয়ে এল। "তুমি এ-সব কী বলছ? আমার ভিতর এমন কিছু নেই, যা দেখতে পেলে আমার বা অপর কারো কোন উপকার হবে।"

অদূরে একটা জয়ধ্বনি উঠল এই সময়ে। বহু লোকের আনন্দ-কোলাহল! "এর মানে কী? সীজারকে ওরা রাজা করে দিলে নাকি?"—বলে উঠলেন ব্রুটাস।

"তোমার কথার সুর শুনে মনে হয়—সীজার রাজা হলে তোমার আপত্তি আছে।" টিপ্পনী করলেন কেসিয়াস।

"অবশ্যই আপত্তি আছে।"—জোরের সঙ্গে ব্রুটাস জবাব দিলেন—"আপত্তি অবশ্যই আছে। যদিও আমি সীজারকে ভালবাসি। কিন্তু কেসিয়াস—কী তুমি বলতে চাও আমাকে? রোমের যাতে কল্যাণ হয়, এমন কথা কিছু যদি তুমি আমাকে বলতে ইচ্ছা কর, নির্ভয়ে বলতে পার। সে-কথা শোনার ফলে আমার যদি মৃত্যুও হয়, তবু আমি আগ্রহ করে তা শুনব।"

"সে-মহত্ত্ব তোমার আছে, তা আমি জানি ব্রুটাস!"—কেসিয়াস ধীরে ধীরে তাঁর বক্তব্যের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। "কল্যাণ, রোমের কল্যাণ! রোমবাসীর কল্যাণ! আমি এমন কথাই কিছু বলতে চাই—যাতে রোমবাসীর কল্যাণ হবে, তাদের মর্যাদা রক্ষা হবে। মর্যাদা! রোমকদের মর্যাদা! আমি মনে করি ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকা মৃত্যুর চাইতেও খারাপ। স্বাধীন হয়ে জন্মেছি! তুমি এবং আমি! সীজারের মতই স্বাধীন। যে-খাদ্য সীজার খেয়েছে কৈশোরে, যৌবনে, আমরাও সেই খাদ্য খেয়েই মানুষ হয়েছি। শক্তি তারও যা আছে, আমাদেরও তাই আছে। বরং বেশী আছে। সে-

বছর শীতের এক ঝড়বাদলার দিনে সীজার আর আমি এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম—টাইবারের কূলে। নদীতে বড় বড় ঢেউ উঠছে তখন। সীজার আমায় বলল—"ঐ নদীতে সাঁতার কাটবার সাহস তোমার হয়?" আমি উত্তর না করে লাফিয়ে পড়লাম নদীর বুকে। সীজার আর কী করে, ইচ্ছা না থাকলেও নামতে বাধ্য হল। সাঁতার কেটে চললাম দুজনে। কী প্রবল স্রোত! কী পাগলা ঢেউ! কিছুদূর যেতেই—পিছন থেকে কাতর কণ্ঠ শুনতে পেলাম সীজারের—"ধর কেসিয়াস,—ধর! আমি ডুবে যাচ্ছি!" সেদিন ক্রুদ্ধ টাইবারের গ্রাস থেকে সীজারকে আমি উদ্ধার করে আনি। আর আজ? আজ সেই সীজার হয়েছে দেবতা! তার মুখের প্রত্যেকটি কথা রোমকেরা আজ দেবতার বাণীর মত লিখে রাখে তাদের কেতাবে।

এমন সময় আবার অদূরে জয়ধ্বনি!

ব্রুটাস আবার আশঙ্কা প্রকাশ করলেন—"নিশ্চয়ই সীজারের উপর আজ আবার নতুন কোন সম্মান চাপিয়ে দিচ্ছে রোমের অধিবাসীরা!"

"দেবে বই কি।" বাঁকালো গলায় টিপ্পনী করলেন কেসিয়াস—"সীজারকে ছাড়া আর সম্মান দেবে কাকে? সীজার ছাড়া রোমে আর আছে কে? কলোসাস দৈত্যের মত আকাশে মাথা তুলে সে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, তার দু'পায়ের ফাঁকে ফাঁকে। অথচ—এমনটা রোমে আর কোনদিন হয়নি। একটিমাত্র মানুষ দেশ শাসন করছে—এমনটা কোনদিন রোমে ছিল না। তোমারই এক পূর্বপুরুষ ছিলেন আর এক ব্রুটাস। লোকে তাঁর কথা বলত—ব্রুটাস থাকতে রোমে শয়তানের প্রভুত্বও চলবে না, রাজারও না! আর আজ? সেই রোমে সীজার হতে যাচ্ছে রাজা!"

ব্রুটাস অপলক চোখে তাকিয়ে রইলেন কেসিয়াসের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"তুমি আমায় কী বলতে চাও, তা আমি বুঝেছি, এ-সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেছি। পরে তোমার আর আমার মধ্যে এ-নিয়ে আলোচনা হবে। এখন নয়, ঐ কাস্কা আসছে, ওর কাছে আগে শোনা যাক—বারবার ওদিকে জয়ধ্বনি উঠছিল কেন।"

কাস্কার মুখে শোনা গেল সেই কথাই—যা ব্রুটাস এখানে দাঁড়িয়েই

অনুমান করেছিলেন। কোথা থেকে একটা রাজমুকুট নিয়ে এসে অ্যান্টনি তা পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন সীজারের মস্তকে। একবার নয়—তিন-তিন বার। তিনবারই সীজার তা হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন—কিন্তু দিয়েছেন যে অনিচ্ছায়, তাতে কাস্কার কোন সন্দেহ নেই। নিতে পারলেই খুশী হতেন নিশ্চয়, পারেননি লোকের ভয়ে। ওখানে যারা চেঁচিয়ে মরছে, তারা ছাড়াও ত মানুষ আছে রোমে!

কেসিয়াস সেই রাত্রেই কাস্কাকে নিজের গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণ করলেন।

শুধু কাস্কা নয়, আরও অনেকে সমবেত হলেন কেসিয়াসের গৃহে সেই রাত্রে। ষড়যন্ত্র শুরু হল। সীজারের আশা অনেক। তিনি রাজা হতে চান। রোমবাসীরা হাজার বৎসর আগে রাজার উচ্ছেদ করেছে রোম থেকে; দেশে এনেছে গণতন্ত্র, জনগণের শাসন। আজ কি স্বাধীন রোমকগণ আবার যেচে একটা রাজার পদানত হবে? না।

নৈশভোজনের পর সবাই গেল ব্রুটাসের গৃহে। তাঁকে দলে আনা দরকার। কারণ সৎলোক বলে কেসিয়াস বা অন্য কারও সুনাম নেই রোমে। সে-সুনাম একমাত্র ব্রুটাসেরই আছে। তিনি দলে না থাকলে রোমের জনসাধারণ এদের বিশ্বাস বা সাহায্য কিছুই করবে না। অথচ ব্রুটাস ভালবাসেন সীজারকে।

তাই তাঁর সমুখে আজ এক ভীষণ পরীক্ষা। রোমের যাতে ভাল হবে, তাই তিনি করবেন? না, সীজার যা চাইছেন, তাইতেই সায় দেবেন? দেশকে বড় আসন দেবেন, না বন্ধুত্বকে?

কেসিয়াসের দল মাতৃভূমির নামে তাঁর সহযোগিতা চাইলেন। সকলের আগে রোম। সীজার কোন্ ছার! রোমের স্বাধীনতার জন্য নিজের হাতে কলিজা উপড়ে ফেলতে হবে প্রত্যেক রোমক নাগরিককে।

ব্রুটাসকে স্বীকার করতে হল যে তিনি সীজারকে অপসারিত করার জন্য চেষ্টা করবেন, ওদের ষড়যন্ত্রে যোগ দেবেন। সকলের আগে রোম! সীজারের চাইতেও রোম বেশী প্রিয় ব্রুটাসের কাছে।

সীজার যদি উচ্চাশার বশে সেই রোমের স্বাধীনতাকে পদদলিত করতে চান, তবে সীজারের স্থান নেই রোমে।

কিন্তু হত্যা ভিন্ন সীজারকে সরানো সম্ভব নয়। সৈন্য সব তাঁরই হাতে, জনগণও বেশীর ভাগ তাঁরই সমর্থক, নিজে তিনি অদ্বিতীয় সেনাপতি; যুদ্ধ যদি বাধে, ষড়যন্ত্রীরা এক মুহূর্তও দাঁড়াতে পারবে না তাঁর বিরুদ্ধে। অতএব—হত্যাই তাঁকে করতে হবে! অন্য উপায় নেই।

* * *

মার্চের পনেরোই তারিখ।

সিনেট সভা নিমন্ত্রণ করেছেন সীজারকে, তাঁদের আজকার অধিবেশনে যোগদান করবার জন্য। সেদিন রাস্তার লোকেরা সীজারকে রাজমুকুট উপহার দিতে চেয়েছিল, তিনি তা নেননি। কেনই বা নেবেন? রাস্তার লোকের কী অধিকার আছে কাউকে রাজপদে বসাবার? সে-অধিকার আছে একমাত্র সিনেটের। আজ সিনেটই সীজারকে রাজমুকুট পরাবেন, এমনি একটা জনরব ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে।

শত্রুরাও প্রস্তুত হয়েছে ঐ দিন, সিনেট সভাতেই, রাজমুকুট মাথায় পরবার আগেই তাঁকে অপসারিত করা হবে।

সীজারের পত্নী কালফর্নিয়া রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখেছেন। সীজারকে তিনি নিষেধ করছেন—"আজ যেয়ো না সিনেট সভায়। আজ বেরিও না নিজের গৃহ থেকে!"

সীজার স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না। সাধারণ লোকে অলক্ষণ-কুলক্ষণে বিশ্বাস করে, সীজারের সে বিশ্বাস নেই। তবু স্ত্রীর কাতর অনুনয় তাঁকে বিচলিত করল। তিনি একবার ভাবলেন—যাবেন না সিনেটে। কিন্তু চক্রীর দল তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে শুরু করল। তাঁকে সরিয়ে ফেলবার জন্য তারা তৈরী হয়ে আছে। আজ যদি সীজার ঘর থেকে না বেরোন, তাহলে তাদের সকল আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। পরে আবার এই আয়োজন নতুন করে গড়ে তোলা হয়ত সোজা হবে না। আজই যা হোক কিছু করে ফেলতে চায় তারা।

সীজারকে তারা বোঝাল। আজই তাঁকে রাজপদে বরণ করতে চায় সিনেট। কিন্তু তিনিই যদি অনুপস্থিত থাকেন, তবে সিনেটের মত পরিবর্তন হতে পারে তো!

সীজার আবার বিচলিত হলেন। এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয়। যাদের তখনও নিজের একান্ত বন্ধু বলে জানেন, তাদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন সিনেটের উদ্দেশ্যে। বিপদের ভয়? সীজারের মনে মনে অহংকার—বিপদের চেয়ে সীজার নিজে বেশী ভয়ংকর। বিপদ সীজারের সমুখ থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছে চিরদিন, আজও পালাবে।

* * * *

এদিকে রোমের জনগণও বিচলিত। নানা দুর্লক্ষণ দেখেছে তারা গত রাত্রিতে। এক সিংহী প্রকাশ্য রাজপথে শাবক প্রসব করেছে। মেঘে মেঘে রক্তবর্ণ দৈত্যদের দেখা গিয়েছে হাতাহাতি লড়াই করতে। একটা ক্রীতদাসের হাত জ্বলে উঠেছিল মশালের মত, কিন্তু হাতের কোন ক্ষতি হয়নি।

অকারণেই কি আর এত সব অলক্ষুণে জিনিস এক সাথে দেখা যাচ্ছে?

একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে—আশঙ্কা করেছে অনেকেই। ব্রুটাসদের ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও ফেলেছে কেউ কেউ। সীজারকে সতর্ক করে দেবার চেষ্টাও করেছে দু'একজন। মিছিল করে যখন সীজার এগিয়ে চললেন সিনেট-পানে, সেই দৈবজ্ঞ আজ আবার এসে দাঁড়াল সীজারের সমুখে।

সীজার তাকে পরিহাস করে বললেন—"কী গো! মার্চের পনেরোই ত এসেছে!"

সে উত্তর দিল—"এসেছে বটে, পেরিয়ে যায়নি!"

তাড়াতাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গেল ষড়যন্ত্রীরা। আর কিছু তাকে বলতেই দিল না।

পথেই এক অধ্যাপক একখানা চিঠি দিলেন সীজারকে। "পাঠ কর সীজার। তোমার নিজের সম্বন্ধে গুরুতর দরকারী কথা!"

. গর্বিত সীজার উত্তর করলেন—"নিজের সম্বন্ধে যা-কিছু কথা, তা পড়ব বা ভাবব সকলের পরে। বর্তমান মুহূর্ত কেবল জনসাধারণের কথা ভাববার জন্য।" পড়লেন না তিনি চিঠি। নিয়তিকে ফাঁকি দেবে কে?

অবশেষে মিছিল উপনীত হল সিনেটের দ্বারদেশে। সীজারের অতি নিকটেই ছিলেন তাঁর অনুরক্ত বন্ধু সেনাপতি অ্যাণ্টনি, ত্রিবোনিয়াস নামে এক ষড়যন্ত্রী, তাঁকে কোন-এক অছিলায় ডেকে দূরে নিয়ে গেল।

কীভাবে কী করতে হবে, সযত্নে আগে থেকে তার ছক তৈরি করে রেখেছে চক্রীরা। মেটেলাস সিম্বার এগিয়ে এল, জানু পেতে বসল সীজারের সমুখে। "দয়া কর, সীজার দয়া কর আমার নির্বাসিত ভ্রাতাকে, দয়া করে মার্জনা কর; তাকে স্বদেশে ফিরে আসতে দাও।"

সীজার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন—"এসব কী মেটেলাস? দেশের আইন কি ছেলেখেলার জিনিস যে তোমার চোখের জলে আর তোষামোদে গলে গিয়ে আমি তা নিজের খেয়ালে উলটে দেব? তোমার ভাই অপরাধ করেছিল; বিচারে তার সাজা হয়েছে; সে-সাজা থেকে তাকে রেহাই দেওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিও নেই, আর রেহাই দেওয়ার অধিকারও কারও নেই।"

এগিয়ে গেলেন ব্রুটাস। "আমি তোমার হস্ত চুম্বন করছি সীজার। মেটেলাসের ভাই পাবলিয়াসকে মুক্তি দাও সীজার।"

অবাক্ হয়ে গেলেন সীজার, মুখে কথাই ফুটল না। ব্রুটাসের মত ন্যায়পরায়ণ লোক যে এমন অন্যায় অনুরোধ করতে পারেন, এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

তাঁকে ভাববার সময় দিল না এরা। এগিয়ে গেলেন কেসিয়াস, "ক্ষমা! ক্ষমা! তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি সীজার ক্ষমা কর পাবলিয়াস সিম্বারকে।"

সীজার মাথা নাড়লেন। একটা দারুণ ঘৃণার আভাস ফুটে উঠল তাঁর চোখে মুখে। কঠিনস্বরে তিনি বললেন—"অনুনয় আমি বুঝি না। নিজেও পারি না অনুনয় করতে, অন্যের অনুনয়কেও দিই না কোন মূল্য। আকাশে তারকা আছে লক্ষ লক্ষ। সবাই জায়গা

পালটায়, পালটায় না কেবল ধ্রুবতারা। আমি সেই ধ্রুবতারা। আমার মত পালটায় না। নির্বাসন থেকে মুক্তি পাবে না সিম্বার।"

সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—"সীজার।"

সীজার বললেন—"অলিম্পাস পর্বতকে শূন্যে তুলবে তোমরা?"

আবার চীৎকার বহুকণ্ঠে—"মহান্ সীজার!"

সীজার বললেন—"দেখনি ক্রুটাস পর্যন্ত জানু পেতে বসেছেন, তবু বিচলিত হইনি আমি? তোমরা তাঁর তুলনীয় কী?"

এগিয়ে এল কাস্কা—বিবেকহীন, বেপরোয়া কাস্কা। "মুখের কথায় কাজ হল না, এবার হাত চালাতে হল!"

সঙ্গে সঙ্গে ছুরিকার আঘাত। সীজার চমকে যেই তার দিকে ফিরতে যাবেন, অমনি অন্য দিক্ থেকে অন্য একজনের ছুরিকা তাঁর দেহে বিদ্ধ হল। একে একে কাছে এসে তাঁকে ঘিরে ধরেছে শত্রুরা। যেদিকে তাকান, সেই দিকেই রক্ত-চক্ষু, সেই দিকেই ছুরিকা উঠেছে তাঁকে লক্ষ্য করে। এক মুহূর্ত আগে যারা ছিল অনুগত পার্শ্বচর, তারাই হঠাৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে আততায়ী, ঘাতক! এমন কি—ব্রুটাসও! সমগ্র রোমে একমাত্র যে ব্যক্তিটিকে বিশ্বাস করতেন, মহৎ বলে শ্রদ্ধা করতেন, সত্যিকার বন্ধু বলে ভালবাসতেন—সেই ব্রুটাসও ছুরিকা বিদ্ধ করেছেন সীজারের বক্ষে!

মহাপ্রাণ সীজার এই অকৃতজ্ঞতার আঘাত সইতে পারলেন না—একবার মাত্র "তুমিও ব্রুটাস?" এই আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

একটা তুমুল কলরব উঠল ষড়যন্ত্রীদের ভিতরে।—"স্বাধীনতা! স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেছি আমরা! অত্যাচারীর পতন হয়েছে!"

এইবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল ষড়যন্ত্রীরা। মহানগরীর সর্বত্র ঘুরে ঘুরে জনগণের সম্মুখে তাদের জবাবদিহি করতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে রোমের প্রত্যেকটি নাগরিকের স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্যই সীজারের মৃত্যু প্রয়োজন হয়েছিল, ব্যক্তিগত শত্রুতা বা উচ্চাশার বশে কেউ সীজারকে আঘাত করেনি।

কোথায় ছিলেন অ্যাণ্টনি এই দারুণ বিপত্তির কালে? সীজারের একান্ত অনুগত বন্ধু অ্যাণ্টনি?

ব্রিবোনিয়াস তাঁকে ডেকে আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল। সেইখানে দাঁড়িয়েই তিনি হঠাৎ কোলাহল শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন। "সীজার হত হয়েছেন"—লোকের মুখে মুখে এই কথা ভেসে এল তাঁর কানে। প্রাণভয়ে তিনি ছুটে পালিয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল—সীজারকে যারা হত্যা করেছে, তারা সীজারের বন্ধু অ্যাণ্টনিকেও রেহাই দেবে না।

চতুর তিনি, গৃহে গিয়ে তক্ষুনি ব্রুটাসের কাছে দূত পাঠালেন। একান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করে, সকল বিষয়ে ষড়যন্ত্রীদের মত অনুসারে চলবেন স্বীকার করে তিনি সাক্ষাৎ করতে চাইলেন ব্রুটাসের সঙ্গে। সে অনুমতি তাঁকে দেওয়া হল। কেউ কেউ বলল যে অ্যাণ্টনিকেও সীজারের পথে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। তা নইলে সে হয়ত পরে একটা গোলমাল পাকিয়ে তুলবে। তাতে আপত্তি করলেন ব্রুটাস। রোমের নাগরিকদের স্বাধীনতা যেতে বসেছিল সীজারের জন্য, তাঁকে অপসারিত করা হয়েছে। অ্যাণ্টনি কে? সামান্য লোক! তাকে ভয় করবার কোন কারণ উপস্থিত হয়নি। তাকে কেন বধ করা হবে? অনর্থক রক্তপাতের পক্ষপাতী ব্রুটাস নন।

অ্যাণ্টনি এলে ব্রুটাস তাঁকে ভদ্রভাবেই গ্রহণ করলেন। বললেন —সীজারকে অপসারিত করা কেন যে প্রয়োজন হয়েছিল, তা তাঁকে পরে অবসরমত বুঝিয়ে দেবেন।

অ্যাণ্টনি প্রার্থনা করলেন—সীজারের দেহ তাঁর হাতে দিয়ে দেওয়া হোক। তিনি তা সমাধিস্থ করবেন; এবং লোকাচার যেমন আছে—সমাধির আগে মৃতের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার অনুমতি পেলে তিনি সুখী হবেন।

ব্রুটাস সরল, তাঁর চাইতে কেসিয়াসের কূটবুদ্ধি অনেক বেশী। এভাবে রোমকদের সমুখে অ্যাণ্টনিকে এখন দাঁড়াতে দিলে যে অনর্থ বাধতে পারে, ব্রুটাস তা না বুঝলেও কেসিয়াস বুঝলেন। তিনি ঘোরতর আপত্তি করলেন এতে। কিন্তু ব্রুটাস এতে কিছুই দোষ

দেখতে পেলেন না। কেসিয়াসের আপত্তি সত্ত্বেও উদার ব্রুটাস অনুমতি দিয়ে দিলেন অ্যাণ্টনিকে! তারপর রোমের ফোরামে প্রথমে ব্রুটাস গিয়ে দাঁড়ালেন জনগণের সমুখে। এই ফোরাম ছিল নগরের মাঝখানে প্রকাশ্য একটা খোলা জায়গা, যেখানে নাগরিকেরা এসে মিলিত রাজপুরুষদের বক্তৃতা শুনবার জন্য বা নিজেদের ভিতর রাজনীতির আলোচনা করবার জন্য। সীজারের মৃতদেহ তখনও সেখানে রক্ষিত ছিল। ব্রুটাস বলতে শুরু করলেন—

"বন্ধু রোমবাসিগণ! স্বভাবতঃই তোমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে সীজারকে হত্যা করা হল কেন! সে-প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আমি তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছি। আমি তোমাদের একটি কথা বলছি—শোনো। আমার চাইতে বেশী তোমরা কেউ সীজারকে ভালবাসতে না। সীজার বীর ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁর স্মৃতিকে সম্মান করি। সীজার মহৎ ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু তাঁর ছিল রাজা হবার উচ্চাশা, তাই আমি তাঁকে অপসারিত করেছি। তোমরা সবাই রোমান। সীজারকে বাঁচিয়ে নিজেরা তাঁর গোলাম বনে যাওয়া, আর সীজারকে হত্যা করে নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখা—এ দুটোর ভিতর কোন্‌টা তোমরা শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর?"

সবাই সমস্বরে বলে উঠল—"স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সীজারকেও আমরা বলি দিতে পারি।"

"তাহলে ত তোমরা আমার সঙ্গে একমত।" ব্রুটাস বললেন —"তাহলে ত কারও অসন্তোষের কাজই আমরা করিনি! এখন তাহলে আর একটি কথা বলি, শোনো তোমরা! অ্যাণ্টনি সীজারের সম্বন্ধে কিছু বলবেন। তাঁর কথা মনে দিয়ে শোনো এবং সীজারের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাও। সীজার বীর ছিলেন, এ সম্মান তাঁকে দেওয়া উচিত।"

ব্রুটাসের মন সরল, হৃদয় মহৎ। অ্যাণ্টনিকে বক্তৃতার সুযোগ দিয়ে যে সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হল, তা তিনি মোটেই বুঝতে পারলেন না!

ব্রুটাস চলে যেতেই অ্যান্টনি উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের উপর। সমবেত জনগণকে সম্বোধন করে বললেন—"বন্ধুগণ! মহান্ ব্রুটাসের দয়ায় আমি তোমাদের সমুখে দুটো কথা কইবার সুযোগ পেয়েছি। দয়া করে শোনো আমার কথা।"

"ব্রুটাসের কোন নিন্দা কিন্তু শুনব না আমরা। ব্রুটাস মহৎ, ব্রুটাস সত্যিকার দেশপ্রেমিক। তিনি যা করেছেন—ঠিক করেছেন।"—শাসিয়ে উঠল একসঙ্গে অনেক লোক।

"তা কি আমি জানি না?" ঝটিতি জবাব করলেন অ্যান্টনি, তাদেরই কথায় সায় দিয়ে। "ব্রুটাস মহৎ লোক। তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন না। আর আমি তো এসেছি—শুধু সীজারকে সমাধিস্থ করবার জন্য! সীজারকে প্রশংসা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আসিনি। ব্রুটাস বলেছেন—সীজার উচ্চাশার বশীভূত ছিলেন। তা যদি তিনি থেকে থাকেন, তবে তার চেয়ে দোষের কথা কী থাকতে পারে? উচ্চাশা খুব খারাপ জিনিস। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই এটা স্বীকার করতে হবে যে তাঁর সে উচ্চাশার কোন পরিচয় কেউ কোনদিন পায়নি। বহু যুদ্ধে তাঁর অসীম বীরত্বের পরিচয় তোমরা পেয়েছ, বহু ক্ষেত্রে তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের পরিচয় তোমরা পেয়েছ, কিন্তু কোন জায়গাতেই তাঁর সে উচ্চাশার পরিচয় কেউ পাওনি। এই সবে সেদিন—আমিই নিজের হাতে, এই রাজপথে, তোমাদের সুমুখে তাঁকে রাজমুকুট পরাতে চেয়েছিলাম। তিনি তা গ্রহণ করেননি! তিন তিনবার তিনি তা নিতে অস্বীকার করেছিলেন। রাজমুকুট নিতে অস্বীকার করা কি উচ্চাশার পরিচয়?"

জনতার যেন চমক ভাঙল! সত্যই ত! এটা ত উচ্চাশার পরিচয় নয়। বরং ঠিক তার বিপরীত! তবে? কী বলে গেল ব্রুটাস?

ধাপে ধাপে চতুর অ্যান্টনি এমনভাবে মৃত সীজারের গুণ কীর্তন আর হত্যাকারীদের চক্রান্তের কথা প্রকাশ করে চললেন যে ব্রুটাসের উপর জনগণের শ্রদ্ধা একেবারেই উপে গেল। আর তাঁরা চেঁচিয়ে ঘোষণা করতে শুরু করল যে, ঘাতকদের হত্যা করে, তাদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে সীজারের হত্যার প্রতিশোধ তারা নেবে।

ক্রোধ তাদের একেবারে চরমে উঠল—যখন অ্যান্টনি তাদের সমুখে পাঠ করলেন সীজারের উইল। সীজার এই উইলে লিখে গিয়েছেন যে তাঁর সমস্ত উদ্যান উপবনগুলি তিনি জনগণের আনন্দ করবার জন্য, ঘুরে ফিরে বেড়াবার জন্য দান করে দিচ্ছেন। আর রোমের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণস্বরূপ তিনি প্রতি রোমক নাগরিককে উপহার দিয়ে যাচ্ছেন পঁচাত্তর দ্রাক্‌মা পরিমিত অর্থ। শেষপর্যন্ত অ্যান্টনি বলে উঠলেন—"তোমরা, রোমক নাগরিকেরা, তোমরাই ছিলে সীজারের উত্তরাধিকারী! বল তোমরা, উচ্চাশার এই কি পরিচয়?"

আর বলবার সময় পাওয়া গেল না। জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। পিতৃসম সীজারের হত্যার প্রতিশোধ নেবে তারা। দলে দলে তারা ছুটে বেরুলো ষড়যন্ত্রীদের সন্ধানে। যেখানে ধরতে পারবে, সেইখানেই বধ করবে তাদের।

যারা ধরা পড়ল জনতার হাতে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ নিহত হল। ব্রুটাস, কেসিয়াস প্রভৃতি কয়েকজন রোম থেকে পালিয়ে গেলেন। সৈন্য যোগাড় করতে লাগলেন আত্মরক্ষার জন্য। লড়তে হবে এবার। সীজার আর নেই, কিন্তু সীজারের শক্তি এখনো আছে। সে-শক্তিকে চূর্ণ করা সহজ নয়।

অ্যান্টনি মিলিত হলেন অক্টেভিয়াসের সাথে। ইনি সীজারের ভাগিনেয়। তরুণ বয়সেই এঁর রাজনীতির জ্ঞান যথেষ্ট, আর যুদ্ধ করতেও ইনি ভালই জানেন। এঁদের সাথে যোগ দিলেন এমিল লেপিদাস আর একজন সেনাপতি ও সিনেট সদস্য।

কিছুদিন এদিকে ওদিকে ছোটখাট যুদ্ধ চলল। ব্রুটাসের সঙ্গে কেসিয়াসের পদে পদে মনান্তর হতে লাগল। ব্রুটাস মহৎ, কোন নীচতার প্রশ্রয় দিতে কোন অবস্থাতেই তিনি প্রস্তুত নন। বিপদের সময়ও নয়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও নয়। অথচ, সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহের জন্য অন্যায় কাজ করতেও কেসিয়াস দ্বিধা করেন না। কলহ এমন স্তরে পৌঁছালো একদিন যে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি বাধবার মত হল! চতুর কেসিয়াস শেষ মুহূর্তে কোমলতার অভিনয় করে একটা আপস-মীমাংসা করলেন বটে, কিন্তু ব্রুটাসের মন

সেই যে বিষিয়ে গেল, সে আর কেসিয়াসের উপর খুশী হতে পারল না।

ঝগড়া মিটিয়ে বিদায় হলেন কেসিয়াস। রাত্রি গভীর হয়ে এল। নিজের শিবিরকক্ষে পাঠে রত ব্রুটাস। খবরাখবর নিয়ে যাওয়ার জন্য নিকটেই দুজন দূত ঘুমিয়ে আছে। ব্রুটাস প্রয়োজন মত তাদের জাগাবেন।

পড়তে পড়তে হঠাৎ ব্রুটাসের মনে হল আলোটা নিভে আসছে, চোখ তুলে তাকিয়েই তিনি দেখলেন—সম্মুখে এক প্রেতমূর্তি। মনে যার পাপ নেই, সে প্রেত দেখেও ভয় পায় না। "কে তুমি? কী তুমি?" প্রশ্ন করলেন ব্রুটাস।

উত্তর হল—"তোমার শনি!"

"কী জন্য আসছ তুমি?"

"এই কথা বলতে যে, ফিলিপিতে আবার দেখা হবে।"

সীজারের প্রেত অন্তর্হিত হল।

সত্যই সে আবার দেখা দিল ফিলিপির রণক্ষেত্রে। যুদ্ধে পরাজিত হলেন ব্রুটাস ও কেসিয়াস। বন্দী হয়ে অশেষ অপমান সহ্য করার চাইতে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়ঃ মনে হল।

রক্তের বদলে রক্ত! সীজারের আত্মা তৃপ্ত হল।

হ্যাম্‌লেট্‌

ডেনমার্কের রাজপ্রাসাদের সিং-দরোজায় রাত্রি বেলায় প্রহরীরা পাহারা দিচ্ছে। বড় ভয়ের জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পাহারা দেওয়া। আজ দু রাত্রি ধরে রাত্রির শেষ-প্রহরের দিকে এক প্রেত-মূর্তি কোথা থেকে এসে দূরে দাঁড়িয়ে নীরবে তাদের দিকে চেয়ে থাকে। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। প্রহরীরা এগিয়ে গেলেই হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। প্রহরীরা অবাক্ হয়ে লক্ষ্য করেছে, প্রেতমূর্তির চেহারা ঠিক যেন আগেকার রাজার মতন—যিনি এই

অল্পদিন হল মারা গিয়েছেন। রোজ রাত্রে এই ভয়ের ব্যাপার ঘটতে দেখে প্রহরীরা গিয়ে ব্যাপারটা হোরেসিওকে জানিয়েছিল। হোরেসিও মৃত রাজার পুত্র যুবরাজ হ্যাম্‌লেটের পরম বন্ধু। এই আশ্চর্য খবর শুনে হোরেসিও নিজে আজ এসে পাহারায় দাঁড়িয়েছেন—প্রহরীদের কথা সত্য কি না, তাই যাচাই করবার জন্য।

সত্য! সত্য!

শেষ রাত্রে হোরেসিও নিজের চোখে দেখলেন সেই প্রেতকে।

আশ্চর্য! এত দূর থেকেও বেশ বোঝা যায় যে হ্যাম্‌লেটের মৃত পিতার সঙ্গে এই প্রেতের খুব একটা মিল আছে চেহারায়।

এর মানে কী? কিছুই বুঝতে না পেরে পরের দিন হোরেসিও রাত্রির প্রেতমূর্তির কথা হ্যাম্‌লেটকে জানালেন।

পিতার মৃত্যুর সময় তরুণ হ্যাম্‌লেট্ রাজধানীতে ছিলেন না। তিনি এসে এক আশ্চর্য গল্প তাঁর কাকা আর মার কাছ থেকে শুনেছেন, বৃদ্ধ রাজা যখন উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেন, সেই সময় এক বিষাক্ত সাপ তাকে কামড়ায়, তারই ফলে তিনি মারা যান। পিতার মৃত্যুতে খুবই দুঃখ পেয়েছেন তরুণ হ্যাম্‌লেট্, কিন্তু তারও চেয়ে তাঁর মনে বেশী আঘাত লাগল যখন তিনি দেখলেন যে পিতার মৃত্যুর পরে কয়েক সপ্তাহ যেতে না যেতেই তাঁর কাকা ক্লডিয়াস্ বিধবা রানীকে বিয়ে করে ডেনমার্কের সিংহাসন অধিকার করে বসলেন। সমস্ত প্রজা সেই ব্যাপারে মনে মনে অসন্তুষ্ট হলো, কিন্তু ভয়ে তারা মুখে কিছু প্রকাশ করে বলতে পারলো না। একে পিতা হঠাৎ মারা যাওয়াতে তরুণ হ্যাম্‌লেট্ শোকে পাগলের মতন হয়ে গিয়েছেন, তার উপর এই বিশ্রী বিবাহটা ঘটবার পরে দারুণ সন্দেহ এসে তাঁর মনটা জুড়ে বসেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে তাঁর পিতা সর্পাঘাতে মারা গিয়েছেন; অথচ সত্যি সত্যি কি যে ব্যাপার ঘটেছিল, তারও কোন সন্ধান পান না। এ হেন সময়ে হোরেসিও-র কাছ থেকে শুনলেন রাত্রির অন্ধকারে প্রাসাদের সুমুখে সেই প্রেতের আনাগোনার কথা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক করলেন—নিজের চোখে দেখতে হবে ব্যাপারটা কী।

সেদিনই রাত্রিতে হ্যাম্‌লেট্ গোপনে হোরেসিও-র সঙ্গে দুর্গ-দ্বারে

পাহারা দিতে লাগলেন। আর ঠিক রাত্রির শেষ প্রহরের দিকে, ঠিক সেই জায়গায়, আবার সেই প্রেতমূর্তি আবির্ভূত হলো। সেই প্রেত-মূর্তিকে দেখেই হ্যাম্‌লেট্‌ চীৎকার করে উঠলেন—বাবা···ডেনমার্কের রাজা!

দুর্গ-দ্বারের বাঁ দিকে যে প্রান্তর ছিল, তারই এক পাশে দাঁড়িয়ে প্রেতমূর্তি হাতছানি দিয়ে ডাকে···হোরেসিও বন্ধুকে উৎসাহ দিয়ে বলে, "হ্যাম্‌লেট্‌, কোন ভয় নেই, তুমি এগিয়ে যাও, ঐ মূর্তি নিশ্চয়ই গোপনে তোমাকে কোন কথা বলতে চান!"

হ্যাম্‌লেট্‌ আবিষ্টের মতন এগিয়ে চলেন। কাছে গিয়ে তাঁর আর কোন সন্দেহই রইলো না যে এ মূর্তি তাঁর মৃত পিতারই প্রেত-মূর্তি। বেঁচে থাকতে ঠিক যে বেশভূষায় তিনি ঘুরে বেড়াতেন, সেই বেশভূষা পরেই তিনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন!

হ্যাম্‌লেটের অন্তর ভেঙ্গে পড়ে, কাতরভাবে বলেন, "হে প্রেত-মূর্তি, তুমি যদি সত্যই আমার পরলোকগত পিতার আত্মা হও··· কথা বলো! কথা বলো।"

চাপা স্বরে প্রেতমূর্তি বলে উঠলো, "হ্যাম্‌লেট্‌, সত্যই আমি তোমার পিতা, তোমার নিহত পিতা।"

হ্যাম্‌লেট্‌ আর্তনাদ করে উঠেন, "নিহত?"

প্রেতমূর্তি বলে, "হাঁ, আমি তোমার কাকা, ঐ জঘন্য ক্লডিয়াসের দ্বারা নিহত হয়েছি···বাগানে যখন ঘুমোচ্ছিলাম, তখন পাপাত্মা ক্লডিয়াস সিংহাসনের লোভে আমার কানে বিষ ঢেলে হত্যা করেছে, তার সাহায্য করেছে তোমার পাপীয়সী মা—তুমি আমার পুত্র··· আমি এসেছি তোমার কাছে···প্রতিবিধান কর পুত্র!"

হ্যাম্‌লেট্‌ হতবাক্‌ অজ্ঞানের মত হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখেন প্রেতমূর্তি অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে!

হ্যাম্‌লেটের মুখে সেই কথা শুনে হোরেসিও অবাক্‌ হয়ে যান। বলেন, "প্রেতাত্মারা কি কথা বলতে পারে?"

হ্যাম্‌লেট্‌ উত্তর দেন, "হোরেসিও, পুঁথির বাইরেও সত্য আছে···"

সেদিন থেকে তরুণ হ্যাম্‌লেটের সমস্ত মনটাকে জুড়ে বসে রইলো, সেই সেদিনকার রাত্রির ঘটনা। "প্রেতমূর্তির মুখে যা শুনেছি, তা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহলে এর যোগ্য প্রতিবিধান নিশ্চয়ই তাকে

'হ্যাম্‌লেট্, আমি তোমার নিহত পিতা।' [পৃঃ ১২৭

করতে হবে। কিন্তু নিছক একটা প্রেতমূর্তির কথার ওপর নির্ভর করে গুরুতর কিছু করা কি ঠিক হবে? আর কোন বাস্তব প্রমাণ কি পাওয়া যায় না, যাতে কাকার পাপের সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়?"

রাতদিন এই দুশ্চিন্তা করতে করতে হ্যাম্‌লেট্‌ যেন পাগলের মতন হয়ে গেলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী পলিনিয়াসের এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা ছিল, অফিলিয়া তার নাম। অফিলিয়া তরুণ হ্যাম্‌লেট্‌কে অন্তর থেকে ভালবাসতো এবং হ্যাম্‌লেট্‌ও প্রতিদান দিয়েছিলেন সে-ভালবাসার। সবাই জানতো যথাকালে হ্যাম্‌লেটের সঙ্গে অফিলিয়ার বিবাহ হবে।

কিন্তু এখন হ্যাম্‌লেটের হাবভাব দেখে পলিনিয়াস্‌ দিশাহারা হয়ে উঠলেন। যে লোক পিতার শোকে পাগল হতে বসেছে, তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হলে সে-বিবাহ কি সুখের হবে? পলিনিয়াস্‌ নানারকম চিন্তা করতে লাগলেন।

ওদিকে হ্যাম্‌লেট্‌ এক চালাকি করলেন। অন্তর থেকে তিনি বুঝতে পেরেছেন তাঁর চারদিকে একটা চক্রান্ত চলেছে···যে চক্রান্ত তাঁর পিতার মৃত্যুতে শেষ হয়নি। বুঝতে তিনি পেরেছেন, কিন্তু স্পষ্ট করে কাউকে কিছু বলতে পারেন না···কাউকে খোলাখুলি অপরাধী বলে ধরতে পারেন না। এই অবস্থায় রাজা, রানী, পলিনিয়াস্‌, অফিলিয়া প্রত্যেককে আড়াল থেকে লক্ষ্য করা দরকার, প্রত্যেকের আচরণ চুলচেরা বিচার করে খতিয়ে দেখা দরকার।

যাতে অন্য সকলের দিকে নিজে লক্ষ্য রাখতে পারেন, অথচ অন্য কেউ তাঁকে গ্রাহ্যের ভিতর না আনে, সেই মতলবে হ্যাম্‌লেট্‌ এমন ভান করতে লাগলেন যেন তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। ফলে, তাঁর কথাবার্তা, হাবভাব দেখেশুনে রাজপ্রাসাদের সকলেই বিব্রত হয়ে উঠলো। হ্যাম্‌লেটের পাগলামি আবার সাধারণ পাগলামি নয়; এলোমেলো কথার আড়াল থেকে হ্যাম্‌লেট্‌ রাজা, রানী আর পলিনিয়াস্‌কে তীব্রভাবে আঘাত করেন, পাগল বলে উপেক্ষা করলেও তাঁদের মনে সন্দেহ হয়, হ্যাম্‌লেটের সবটাই কি পাগলামি? না, লোকদেখানো পাগলামির আড়ালে কোন সূক্ষ্ম মতলব আছে?

সকলের চেয়ে বিব্রত হয়ে পড়লো সরল-প্রাণা অফিলিয়া। সে সংসারে কুটিলতার কিছুই জানতো না, তার সরল মনে হ্যাম্‌লেটের সেই পাগলামি দেখে এক নিদারুণ যন্ত্রণার সৃষ্টি হল।

এমন সময় হ্যাম্‌লেট্‌ রাজা ও রানীর মনের ভাবটা হাতে-কলমে

যাচাই করে দেখবার জন্যে এক কৌশল করলেন। রাজা ও রানীকে আনন্দ দেবার জন্য মাঝে মাঝে অভিনয়ের ব্যবস্থা হতো রাজবাড়িতে। এই সময়ে একটা অভিনয়ের দল এল নগরে।

হ্যাম্‌লেট্ সেই দলের সঙ্গে গোপনে বন্দোবস্ত করলেন যে রাজ-বাড়িতে অভিনয়ের জন্য এবার তিনি নিজে একখানি নাটক ওদের লিখে দেবেন। অভিনেতারা খুব খুশী হয়ে এতে রাজী হল। যুবরাজ নাটক লিখে দেবেন, যুবরাজ অভিনয় শেখাবেন—এ ত তাদের সম্মানের কথা!

কথা মত নাটক লিখে ফেললেন হ্যাম্‌লেট্। এর গল্পটা হল ঠিক সেইরকম, যে রকমটা তাঁর পিতার প্রেত তাঁকে বলেছিল। রাজার ভাই আর স্ত্রীর ষড়যন্ত্র, বাগানের ভিতর ঘুমন্ত রাজার কানে বিষ ঢেলে দিয়ে হত্যা···এই রকম সব ঘটনা।

অভিনয়ের দিন হ্যাম্‌লেট্ নিকটে বসেই রাজা ও রানীর মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলেন। নাটক যতই এগিয়ে চলে, ক্লডিয়াসের মুখ ততই বিবর্ণ হয়ে উঠতে থাকে, আসনে বসে বার বার তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন; ক্রমে যখন কানে বিষ ঢেলে দেওয়ার দৃশ্য এল, ক্লডিয়াস্ আর বসে থাকতে পারলেন না। আর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে পাংশু মুখে উঠে চলে যান। হ্যাম্‌লেট্ একদৃষ্টিতে ক্লডিয়াস্ আর তাঁর মার মুখের প্রত্যেকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন। এইবার হ্যাম্‌লেটের আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রেত যা বলে গিয়েছে, অক্ষরে অক্ষরে তা সত্য। তাহলে ত হ্যাম্‌লেটের কর্তব্যও এখন স্পষ্ট। পিতার প্রেতমূর্তির কাছে তিনি শপথ করেছেন, এই পাপের প্রতিবিধান তিনি করবেন। এবার তিনি মন স্থির করে ফেলেন—এ পাপ যে করেছে, তাকে তিনি নিজের হাতে নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন।

এই ভাবে মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে হ্যাম্‌লেটের পাগলামি প্রতিদিনই বেড়ে উঠতে থাকে। এদিকে ক্লডিয়াস্, রানী আর পলিনিয়াস্ পরামর্শ করলেন যে, হ্যাম্‌লেট্‌কে আর এখানে রাখা নিরাপদ নয়। তাকে কৌশলে দেশের বাইরে পাঠাতে হবে। ক্লডিয়াসের পাপের কথা সে যেভাবে হোক জেনে ফেলেছে, এখন এখানে থাকতে দিলে সে কবে যেন সাংঘাতিক একটা কাণ্ড করে বসে।

পরামর্শে ঠিক হল যে বিদেশে যাওয়ার কথা রানীই জানাবেন হ্যাম্‌লেট্‌কে।

পলিনিয়াস্ হ্যাম্‌লেটের সঙ্গে রানীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দিলেন। পাছে হ্যাম্‌লেট্ রাগের মাথায় কিছু করে বসে, সেই ভয়ে দরকার হলে তাকে বাধা দেওয়ার জন্য পলিনিয়াস্ সেই ঘরের ভেতর একটা পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

হ্যাম্‌লেট্ যখন মার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, বাইরে থেকে মনে হল তিনি পাগল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তখন তাঁর মন স্থির হয়ে গিয়েছে, সুযোগ পেলেই নিজের হাতে ক্লডিয়াস্‌কে খুন করবেন।

রানী প্রথমেই একটু তিরস্কার করতে যান ছেলেকে। সে ইদানীং ক্লডিয়াস্‌কে যথোচিত সম্মান দেখায় না, এমন কি তাঁর নিজের উপরেও হ্যাম্‌লেটের আর ভক্তি ভালবাসা আছে বলে মনে হয় না ইত্যাদি।

রানীর অন্যায় তিরস্কারে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হ্যাম্‌লেট্। তিনিও দুই একটা পাল্‌টা তিরস্কার করলেন রানীকে। তাতে রানী রেগে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—

"আমি কে, তা কি তুমি ভুলে গিয়েছ?"

"তুমি কী, সেটা আমি তোমাকে এক্ষুনি দেখিয়ে দিচ্ছি—তোমার সমুখে আয়না ধরে। আয়না মানে তোমার কুকর্মের খোলাখুলি বিবরণ। শুনলে তুমি নিজের চরিত্রটা নিজেই ভাল করে বুঝতে পারবে।"

রানীর কিন্তু স্থির হয়ে শোনার সাহস নেই; তিনি ভয় পেয়ে যান হ্যাম্‌লেট্‌কে ক্রুদ্ধভাবে তাকাতে দেখে।

"কি, তুই আমাকে হত্যা করতে চাস্ নাকি?" বলে তিনি ভয়ে চীৎকার করে ওঠেন।

তাই শুনে তলোয়ারের ওপর হাত রেখে হ্যাম্‌লেট্ হো হো করে হেসে ওঠেন।

আরও ভয় পেয়ে রানী চীৎকার করেন, "রক্ষা কর, রক্ষা কর!"

তাই শুনে পর্দার আড়াল থেকে পলিনিয়াস্ চেঁচিয়ে উঠলেন, "ভয় নেই।"

হঠাৎ সেই শব্দ শুনে আর পর্দা নড়তে দেখে, হ্যাম্‌লেটের মনে হল, ঐ পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই পাপাত্মা ক্লডিয়াস্ লুকিয়ে আছে আর এক মুহূর্ত দেরী না করে হ্যাম্‌লেট্ কোমর থেকে তলোয়ার তুলে বাঘের মতন লাফিয়ে পড়লেন পর্দা লক্ষ্য করে, আর রাজা মনে করে

রানী ভয়ে চীৎকার করে ওঠেন ! [পৃঃ ১৩১]

পলিনিয়াসের বুকেই বসিয়ে দিলেন সেই তরবারি। তৎক্ষণাৎ পলিনিয়াসের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে গেল।

এইবার হ্যাম্‌লেট্‌ পাগলামির ভান করে হেসে উঠলেন, আমি মনে করেছিলাম,···একটা ইঁদুর···হা···হা···হা···

সমস্ত রাজপ্রাসাদ ভয়ে কাঁপতে লাগল কাণ্ডকারখানা দেখে।

হ্যাম্‌লেট্‌কে প্রজারা ভালবাসতো। তাই ক্লডিয়াস্‌ সরাসরি হ্যাম্‌লেট্‌কে বধ করতে পারছিলেন না। তারই জন্য তিনি মতলব করেছিলেন তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবার জন্য। এইবার তিনি স্থির করলেন···ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দিয়ে সেইখানেই লোক লাগিয়ে মেরে ফেলবেন হ্যাম্‌লেট্‌কে। ও বেঁচে থাকতে ক্লডিয়াসের মনে শান্তি নেই। হ্যাম্‌লেট্‌ হঠাৎ পলিনিয়াস্‌কে হত্যা করে বসেছে, এতে ওকে তাড়াতাড়ি বিদেশে পাঠাবার একটা সুযোগ ক্লডিয়াস্‌ পেলেন। হ্যাম্‌লেটের জন্য তিনি যেন কত চিন্তিত আর ব্যথিত, এইরকম ভাবখানা দেখিয়ে ক্লডিয়াস্‌ জানালেন, এই হত্যাকাণ্ডকে চাপা দিতে হলে, হ্যাম্‌লেটের উচিত কিছু দিনের মত ইংলণ্ড থেকে ঘুরে আসা।

পলিনিয়াসের হত্যায় দুঃখের আর কোন কারণ না থাকলেও একটা কারণে হ্যাম্‌লেট্‌ সত্যিই ব্যথিত হয়ে উঠলেন, পলিনিয়াস্‌ অফিলিয়ার বাবা। হ্যাম্‌লেট্‌ যে তার বাবাকে হত্যা করেছেন, সরল-প্রাণা অফিলিয়া এতে বড় দুঃখ পেলো, কিছুতেই নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারল না। হ্যাম্‌লেট্‌কে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, অথচ সেই হ্যাম্‌লেট্‌ই তার স্নেহময় পিতাকে খুন করলেন! অফিলিয়ার দুচোখ দিয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়ে। কিছুতেই কোন দিক্‌ থেকে মনকে সে প্রবোধ দিতে পারে না।

হ্যাম্‌লেট্‌ দেখলেন ক্লডিয়াসের পরামর্শ অনুযায়ী কিছু দিনের জন্যে ইংলণ্ডে যাওয়া ছাড়া গতি নেই তাঁর; পলিনিয়াস্‌ লোকটা দৈবাৎ মারা পড়ার দরুন তার প্রতিহিংসা নেওয়ার পথে আপাততঃ একটা প্রকাণ্ড বাধা এসে পড়েছে। অগত্যা তিনি রাজী হয়ে গেলেন দেশ ছেড়ে যেতে। ক্লডিয়াস্‌ নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁর যাত্রার সমস্ত আয়োজন করে দিলেন। কয়েকজন অনুচর দেওয়া হল হ্যাম্‌লেটের সঙ্গে, তারা ক্লডিয়াসের খুব বাধ্য। সেই অনুচরদের নায়কের হাতে রইল ক্লডিয়াসের একখানা চিঠি। ইংণ্ডের রাজা তখন ডেনমার্কের

অধীন। এ-চিঠি সেই ইংলণ্ডের রাজার নামে। এতে ক্লডিয়াস্ লিখে দিলেন, হ্যাম্‌লেট্‌কে যেন ইংলণ্ডে নামার সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করা হয়।

কিন্তু জাহাজে যেতে যেতে দৈবাৎ সেই চিঠি হ্যাম্‌লেটেরই হাতে পড়লো; হ্যাম্‌লেট্‌ নিজের নাম কেটে সেখানে দুজন অনুচরের নাম বসিয়ে দিয়ে চিঠি আবার যথাস্থানে রেখে দিলেন। তারপর ঘটনার চাকা ঘুরল অন্যদিকে। সমুদ্র-পথেই জাহাজ জলদস্যুদের হাতে পড়ল।

হ্যাম্‌লেট্‌ বীর, দস্যুদের দুঃসাহস দেখে তিনি পালটা আক্রমণ করলেন তাদের। দুটো জাহাজ পাশাপাশি আসতেই লাফিয়ে গিয়ে উঠলেন দস্যুজাহাজে; তলোয়ার খুলে হত্যা করতে লাগলেন দস্যুদের। তিনি আশা করেছিলেন তাঁর সঙ্গীরাও তাঁর পিছনে পিছনে এসে যুদ্ধে যোগ দেবে। তা যদি দিত, তাহলে দস্যুরা সবাই কাটা পড়ত হয়ত। কিন্তু ও লোকগুলো তা করল না। দস্যুরা যখন হ্যাম্‌লেটের আক্রমণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তারা জাহাজ নিয়ে পালিয়ে গেল। হ্যাম্‌লেট্‌ একা দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে এক সময় তাদের হাতে বন্দী হয়ে পড়লেন। তাঁর সেই বীরত্ব ও সুন্দর চেহারা দেখে দস্যুদের নায়ক শত্রুতা ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলো এবং হ্যাম্‌লেটের মুখ থেকে যখন শুনলো, হ্যাম্‌লেট্‌ ডেনমার্কের যুবরাজ, তখন খাতির করে জাহাজ ফিরিয়ে তাঁকে আবার ডেনমার্কের এলাকায় নামিয়ে দিয়ে গেল।

এদিকে রাজধানীতে আর এক কাণ্ড! হ্যাম্‌লেট্‌ এতদিন করছিলেন পাগলামির অভিনয়। এবার কিন্তু পিতার শোকে অফিলিয়া সত্যি সত্যি পাগলিনী হয়ে গিয়েছে। রাতদিন পিতার কবরে পড়ে থাকে, কবরের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, ফুল ছড়ায়, কখন কখন বা আপনার মনে আকাশের দিকে চেয়ে গান গেয়ে ওঠে। লোকজন কেউ কাছে এলে ফুল তুলে নিয়ে তাদের হাতে দেয়, বলে, "দাও দাও, কবরে ফুল দাও।"

যখন রাজধানীতে এই সব ব্যাপার অতি দ্রুতছন্দে ঘটে চলছিল, সেই সময় পলিনিয়াসের ছেলে লিয়ার্টিস্ দেশে ফিরে এল। কিছুদিন আগে সে ফরাসীদেশে গিয়েছিল; লিয়ার্টিস্ হ্যাম্‌লেটেরই সমবয়সী··· একজন ভাল তলোয়ার খেলোয়াড়। লিয়ার্টিস্ রাজধানীতে ফিরে এসে

যখন শুনলো, হ্যাম্‌লেট্‌ তার পিতাকে খুন করেছে, আর তার ফলে অফিলিয়া পাগল হয়ে গিয়েছে, তখন তার সব রাগ হ্যাম্‌লেটের ওপর গিয়ে পড়লো। সেই রাগ আরও উসকিয়ে দিল পাপাত্মা ক্লডিয়াস্‌।

ক্লডিয়াস্‌ সমস্ত দোষ হ্যাম্‌লেটের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে লিয়ার্টিস্‌কে উত্তেজিত করতে লাগলেন, "যদি তুমি সত্যই পিতৃভক্ত বলে পরিচয় দিতে চাও, তাহলে তোমার উচিত, পিতৃ-ঘাতককে হত্যা করা···হ্যাম্‌লেট্‌ পাগল সেজে শঠতার সঙ্গে তোমার বাবাকে হত্যা করেছে···তাকে যোগ্য শাস্তি দেওয়া তোমার কর্তব্য। কিন্তু হঠাৎ রাগের মাথায় উত্তেজিত হয়ে এখন কিছু করতে যেও না···একেবারে চুপ করে থাকো এখন···আমার ওপর ছেড়ে দাও···আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি!"

রাজার কাছ থেকে বেরিয়ে লিয়ার্টিস্‌ অফিলিয়ার সন্ধানে গিয়ে দেখে, সে নদীর ধারে আপনার মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লিয়ার্টিস্‌কে দেখে যেন সে চিনতে পারে না। লিয়ার্টিসের অন্তরে শোকের আগুন দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। লিয়ার্টিস্‌ যতই বোনকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, অফিলিয়া সে কথা কানেই তোলে না। সত্যিকার যে পাগল, সে অন্যের কথা কানে তুলবে কেন? তুললেই বা তার মানে বুঝবে কেন? সে আপনার মনে গান গেয়ে চলে, বন থেকে ফুল তুলে নিজের চুলে পরায়, সারাদিন নদীর ধারে বসে বসে মালা গাঁথে, গাঁথা হয়ে গেলে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়।

এদিকে হ্যাম্‌লেট্‌ ফিরে আসছেন শুনে তাঁকে বধ করবার এক নূতন ফন্দী করেছেন ক্লডিয়াস্‌। তিনি এক তলোয়ার খেলার উৎসব আরম্ভ করে দিলেন। ডেনমার্কের তরুণমহলে হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিস্‌ দুজনেরই ভাল তলোয়ার খেলোয়াড় বলে খ্যাতি ছিল। ক্লডিয়াস্‌ যেন নিছক খেলার আনন্দের জন্যেই হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিসের মধ্যে এই খেলার আয়োজন করলেন। এই সব প্রতিযোগিতায় একরকম কম ধারালো তলোয়ার নিয়ে খেলা হয়। কিন্তু ক্লডিয়াস্‌ লিয়ার্টিসের তলোয়ারে অতি মারাত্মক বিষ মাখিয়ে রেখে দিলেন···সেই বিষের সামান্য একটু রক্তে ঢুকলেই মানুষ মরে যায়।

যদি কোনরকমে হ্যাম্‌লেট্‌ তলোয়ারের সামান্যতম আঘাত থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন, সেই আশঙ্কায় ক্লডিয়াস্‌ আর একটা বিষের ফাঁদ তৈরি করে রাখলেন। যুদ্ধের সময় তৃষ্ণার্ত হয়ে হ্যাম্‌লেট্‌ যখন জল চাইবেন, তখন তাঁকে বিষ-মেশানো সরবত দেওয়া হবে, হ্যাম্‌লেটের জন্যেই একটা আলাদা পাত্রে তৈরি রাখা হবে সে-সরবত।

যদিও পিতাকে হত্যা করবার জন্য লিয়ার্টিস্‌ হ্যাম্‌লেটের উপর নিদারুণ রেগে ছিল, তবু এইভাবে আগে থেকে ফন্দী এঁটে পাপের আশ্রয় নিয়ে খেলার ছলে তাঁকে হত্যা করতে তারও বিবেকে লাগছিল। কিন্তু এই সময় হঠাৎ আর একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা তার অন্তরকে এমনভাবে আকুল করে তুলল যে তাতেই লিয়ার্টিসের মন থেকে সমস্ত বিবেককে নিঃশেষে মুছে ফেলে দেওয়ার সুযোগ পেল ক্লডিয়াস্‌।

পাগল হয়েও অফিলিয়া হ্যাম্‌লেটের কথা ভুলতে পারেনি। এক-দিন তার মাথায় খেয়াল চাপল যে তার আজ বিবাহ হবে হ্যাম্‌লেটের সাথে। অমনি সে নববধূর বেশে নিজেকে সাজিয়ে ফেলল, আর সেই বেশেই নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে এক উইলো গাছের ডালে মালা পরাতে গেল। দৈবের খেলা—পলকা-ডাল ভেঙে গেল হঠাৎ। গাছটা ছিল নদীর উপরে। ডাল ভাঙ্গতেই অফিলিয়া পড়ে গেল জলে। নদীর জলে যখন তার মৃতদেহ ভেসে উঠল, তখন সবাই দেখে অবাক্‌ হয়ে গেল, সে দেহের মধ্যে মৃত্যুর কোন চিহ্ন নেই··· নববধূর বেশে ফুলমালায় সজ্জিত অপরূপ সুন্দরী তরুণী যেন নদীর জলে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

পলিনিয়াসের হত্যার পর হ্যাম্‌লেট্‌ আর আগের মতন অফি-লিয়ার সঙ্গে দেখা করতে পারতেন না। দু-একবার যখন দেখা হয়েছিল, সেই সময় হ্যাম্‌লেট্‌ পাগলের অভিনয় করেছিলেন। হ্যাম্‌লেটের কোন কথার মানেই অফিলিয়া বুঝতে পারত না। অবশ্য সেই সব কথার ভেতর দিয়ে হ্যাম্‌লেট্‌ তাঁর অন্তরের সুগভীর ভাল-বাসার কথাই অফিলিয়াকে নিবেদন করতেন। পাগলের কথা মনে করে অফিলিয়া তার বিকৃত অর্থই করে নিত, আর আনন্দ না পেয়ে

তাতে বরং পেত দুঃখ। তবু এই সমস্ত বিরূপ ঘটনার মধ্য দিয়ে অফিলিয়া সম্পর্কে হ্যাম্‌লেটের ভালবাসা এতটুকু কমেনি, বরঞ্চ আরো গভীর, আরো করুণ, আরো মমতাময় হয়ে উঠেছিল। অফিলিয়ার সেই শোচনীয় মৃত্যুর খবর হ্যাম্‌লেট্ শুনতে পেলেন রাজধানীতে প্রবেশ করবার আগেই। শুনে তাঁর বেদনাতুর মন সত্যি সত্যিই ভেঙে পড়লো এইবার।

হ্যাম্‌লেট্ নিঃশব্দে গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করে সোজা কবরভূমির দিকে যাত্রা করলেন। যাবার সময় খুঁজে সঙ্গে নিলেন বন্ধু হোরেসিওকে।

দুই বন্ধুতে শ্মশানে এসে দেখেন, দুজন লোক কবর খুঁড়ছে··· কবর খুঁড়ছে আর ভালবাসার গান গাইছে।

অবাক্ হয়ে হ্যাম্‌লেট্ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, "এটা কিরকম ব্যাপার? মৃতের জন্যে কবর খুঁড়তে খুঁড়তে মানুষ এমন উদাসীন-ভাবে গান গাইতে পারে?"

হোরেসিও বলে, "বন্ধু, তুমি আজ হয়ত এই প্রথম কবর-খোঁড়া দেখছো, কিন্তু ওদের এই কাজ · সারা জীবন ধরে কবরের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কবরের শোক বা বিভীষিকা তাদের মন থেকে চলে গিয়েছে··· প্রত্যেক মৃত্যুতে যদি ওরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়তো, তাহলে আর ওরা কবর-খোঁড়ার কাজ করতে পারতো না।"

হ্যাম্‌লেট্ এগিয়ে গিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেন।

হ্যাম্‌লেট্ জিজ্ঞাসা করেন, "কবরটা খুঁড়ছো কি কোন পুরুষের জন্য?"

—"না, হুজুর!"

—"তাহলে, সে কি কোন স্ত্রীলোক?"

—"তাও নয়, হুজুর!"

—"তবে? কার কবর খুঁড়ছো?"

—"যার কবর খুঁড়ছি, সে এখন পুরুষও নয় স্ত্রীলোকও নয়··· একটা মৃতদেহ শুধু। হাঁ···একদিন সে স্ত্রীলোক হয়ে বেঁচে ছিল বটে।" এমন সময় দূর থেকে শোনা যায় শোক-শোভাযাত্রার মথিতধ্বনি।

হ্যাম্‌লেট্‌ আর হোরেসিও লুকিয়ে পড়েন। অফিলিয়ার শবদেহ কফিনে নিয়ে রাজা, রানী, লিয়ার্টিস্‌ শান্তভাবেই ধীরে ধীরে প্রবেশ করেন।

যথারীতি শেষকার্য সব হয়ে গেলে শবদেহকে মাটিতে শোয়ানো হল, তারপর তার ওপর প্রত্যেকেই তিনমুঠো করে মাটি ছড়িয়ে দিতে লাগলো। লিয়ার্টিসের শোক উথলে উঠলো, সে আর থাকতে না পেরে তারস্বরে বিলাপ করতে লাগলো। তার বিলাপ শুনে হ্যাম্‌লেট্‌ আর আড়ালে চুপ করে থাকতে পারলেন না। ছুটে লিয়ার্টিসের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং পাগলের মতন ভঙ্গী বজায় রেখে লিয়ার্টিস্‌কে ব্যঙ্গ করে বলে উঠলেন—"বোনের জন্য হাত-পা ছোড়া থামাও···তুমি জান অফিলিয়াকে আমি যেরকম ভালবাসি তোমার মতন হাজারটা ভায়ের ভালবাসা তার কাছে পাহাড়ের কাছে সর্ষের মতন! তুমি কি করতে পার অফিলিয়ার জন্যে? আস্ত কুমির খেতে পার? আমি পারি। ঐ মাটির তলায় গিয়ে শুয়ে থাকতে পার? আমি পারি।"

সেই শোকের সময় হঠাৎ হ্যাম্‌লেট্‌ কর্তৃক এইভাবে লাঞ্ছিত হয়ে লিয়ার্টিস্‌ নিজের জ্ঞান হারিয়ে ফেলল···তৎক্ষণাৎ সে তলোয়ার নিয়ে তেড়ে গেল হ্যাম্‌লেট্‌কে। ধূর্ত ক্লডিয়াস্‌ তাড়াতাড়ি লিয়ার্টিস্‌কে টেনে নিয়ে বলে, "লিয়ার্টিস্‌, করছো কি? পাগলের সঙ্গে ঝগড়া করে? ও কি আর মানুষ আছে?"

সঙ্গে সঙ্গে কানে কানে ক্লডিয়াস্‌ বলেন, "লিয়ার্টিস, এখানে নয়···আমি যে ফন্দী এঁটে রেখেছি, সেকথা স্মরণ কর···স্থির হও!"

লিয়ার্টিসের মন থেকে বিবেকের শেষ দংশনটুকু চলে যায়।

হ্যাম্‌লেট্‌ কিন্তু মনে মনে লিয়ার্টিস্‌কে খুবই ভালবাসতেন। তাই কবরখানায় সেই ঘটনার ফলে তাঁর মনে নিদারুণ ব্যথা লাগে। হ্যাম্‌লেট্‌ নিজে উপযাচক হয়ে লিয়ার্টিসের সঙ্গে দেখা করেন এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ক্লডিয়াস্‌ লিয়ার্টিসের কানে সময় বুঝে মন্ত্রণা দেন। লিয়ার্টিস্‌

হ্যাম্‌লেট্‌কে পুরানো বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তলোয়ার খেলায় আহ্বান করে। বন্ধুর আহ্বান পেয়ে হ্যাম্‌লেট্‌ তা গ্রহণ না করে পারেন না।

ক্লডিয়াসের আনন্দ দেখে কে! বিরাট সমারোহ করে সেই তলোয়ার-খেলার আসর গড়ে তোলা হলো। নির্দিষ্ট দিনে ক্লডিয়াস্‌ ও রানী দরবারে বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে সেই খেলা দেখতে এলেন!

হ্যাম্‌লেট্‌ জানেন না, লিয়ার্টিসের বন্ধুত্বের আড়ালে কি নিদারুণ প্রতিহিংসার শিখা জ্বলছে।

রাজা যেরকম পরামর্শ দিয়েছিলেন, সেই অনুযায়ী লিয়ার্টিস্‌ দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘন করে ভোঁতা তলোয়ারের বদলে একটা শাণিত তলোয়ার ঠিক করে রাখে এবং তার সর্বাঙ্গে মাখিয়ে রাখে মারাত্মক বিষ! সেইটি নিয়েই সে খেলায় নামবে।

খেলার উৎসব আরম্ভ হওয়ার আগে নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আহ্বান করে রাজা ক্লডিয়াস্‌ আনন্দ গদগদচিত্তে ঘোষণা করেন, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, ভগবানের দয়ায় একটা পুরানো শত্রুতা দূর করে তার জায়গায় আবার মিত্রতার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। আজকের এই তলোয়ার খেলা হলো—সেই শুভ-ঘটনারই উৎসব। ডেনমার্কের রাজবংশের সঙ্গে মন্ত্রীবংশের নানা-কারণে যে বিরোধ জেগে উঠেছিল, আমি পুরানো ভুলচুক, ত্রুটী অন্যায়ের কথা আজ আর তুলতে চাই না···আজ যুবরাজ হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিস্‌ আপনাদের সামনেই পরম বন্ধুভাবে মিলিত হচ্ছেন···তাঁরা দুজনেই তরুণ···আমাদের অন্তরের প্রিয়···রাজ্যের ভরসা···এই মিলনকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে আজ তাঁরা দুজনেই আনন্দে এই তলোয়ার খেলার উৎসবে যোগদান করছেন···আমার আর রানীর সঙ্গে সঙ্গে আমি জানি আপনারা সকলেই আনন্দিত হয়েছেন!

নিমন্ত্রিতরা জয়ধ্বনি করে ওঠে। চারিদিকে আনন্দ-সঙ্গীত বেজে ওঠে! তার মধ্যে তলোয়ার খেলার বেশ পরিধান করে হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিস্‌ প্রবেশ করেন।

ক্লডিয়াসের বক্তৃতা আর জনতার জয়ধ্বনি হ্যাম্‌লেটের সরল অন্তরে গভীর রেখাপাত করে। অফিলিয়ার অভাবে তাঁর অন্তর হাহাকার

করছিল—ভালবাসার পাত্র না পেয়ে। সেখানে আবার লিয়ার্টিস্‌কে বন্ধুভাবে পেয়েছেন মনে করে তাঁর অন্তর স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে। লিয়ার্টিসের সঙ্গে যে সব ঝগড়া এক সময়ে হয়েছে, তার জন্যে তাঁর অন্তরে সত্যিকারের অনুতাপ জেগে ওঠে। খেলা আরম্ভ হবার আগে, লিয়ার্টিসের দুহাত ধরে অন্তরের গভীরতা থেকে হ্যাম্‌লেট্‌ বলেন, "বন্ধু, ভুলে যাও উন্মাদ হ্যাম্‌লেটের ত্রুটী। তোমার প্রতি যে লোক দুর্ব্যবহার করেছিল, সে আমি নই·· সে এক উন্মাদ···উন্মাদের ব্যবহার মনে রাখতে নেই।"

হ্যাম্‌লেটের এই আন্তরিক স্নেহবাক্যের উত্তরে লিয়ার্টিস্‌ সকলকে শুনিয়ে বলে, "তোমার কথা শুনে আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নেই হ্যাম্‌লেট্‌! আজ থেকে তুমি আর আমি সেই পুরানো বন্ধু!"

আনন্দে আবার জয়ধ্বনি করে ওঠে জনতা।

সে-উল্লাসে ক্লডিয়াস্‌ও যেন মেতে ওঠেন। সুরা পরিবেশককে ডেকে বলেন, "সুরার পাত্রগুলি আমার কাছে নিয়ে এসো···আমি নিজে আজ মিলনোৎসবে সবাইকে সুরার পাত্র ভরে দেবো"··· এই বলে ক্লডিয়াস্‌ একটা পাত্রে সুরা ঢেলে নিজে পান করেন, এবং ঘোষণা করেন, এই সুরাপাত্র তিনি মুখে তুললেন হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিসের মিলন কামনা করে।

সঙ্গে সঙ্গে বাদকদের আদেশ দিতেই চারদিক থেকে জয়বাদ্য বেজে ওঠে·· হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিস্‌ দুজনে এগিয়ে গিয়ে যাঁর যাঁর তলোয়ার তুলে নেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীরা খেলার আগে পরস্পরের তলোয়ার পরীক্ষা করে দেখে নেয়। কিন্তু আজ মিলনের আনন্দে হ্যাম্‌লেট্‌ সে-পরীক্ষা করতে চাইলেন না, শুধু লিয়ার্টিসের দিকে চেয়ে একবার প্রশ্ন করলেন, "সব ঠিক আছে তো, ভাই?"

লিয়ার্টিস্‌ হেসে বলে, "তাতে সন্দেহ আছে নাকি?"

দুজনে হাসতে হাসতে খেলার আসরে প্রবেশ করেন। খেলোয়াড়-দের উত্তেজনা জোগাবার জন্যে বাজনা ক্রমশঃ জোরে বাজতে থাকে।

হ্যাম্‌লেট্‌ তলোয়ার হাতে লিয়ার্টিসের দিকে এগিয়ে চলেন। শুরু হয় তাঁদের তলোয়ার খেলা।

হ্যাম্‌লেট্‌ আর লিয়ার্টিস্‌ দুজনেই পাকা তলোয়ার খেলোয়াড়। ক্রমশঃ খেলার উত্তেজনায় তাঁরা চাঙ্গা হয়ে ওঠেন। এই জাতীয় খেলার নিয়ম হলো, কেউ কাউকে গভীরভাবে আঘাত করবে না। হ্যাম্‌লেট্‌ অক্ষরে অক্ষরে সেই নিয়ম মেনে চলেন। লিয়ার্টিস্‌ মনে মনে ভাবে, কখন কোন্‌ সুযোগে সে হ্যাম্‌লেট্‌কে গভীরভাবে আঘাত করবে। প্রথম দিকে সে দু'একবার সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু তখনো তার বিবেকে আঘাত লাগছিল। কিন্তু হ্যাম্‌লেট্‌ ক্রমশঃ খেলায় তাকে কাবু করে ফেলেন, লিয়ার্টিস্‌ ধীরে ধীরে গরম হয়ে ওঠে।

আজ ক্লডিয়াসের পাশে রানীও এসে বসেছেন। যদিও তিনি ক্লডিয়াসের মহাপাপের সঙ্গিনী, কিন্তু আজকার এই খেলার অছিলায় হ্যাম্‌লেট্‌কে হত্যা করার চক্রান্তের কথা রাজা তাঁকে জানাননি। কারণ তিনি জানেন রানীর নারীহৃদয়ের মাতৃস্নেহ একেবারে মরে যায়নি। এত কাণ্ডের পর হ্যাম্‌লেট্‌ আবার আগেকার মত সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন, একদিন তিনি মার কাছে এসে আন্তরিক-ভাবে ক্ষমাও চেয়েছেন। সেই আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে রানীর মাতৃস্নেহ। রানী অন্তর থেকে বিশ্বাস করতে লাগলেন যে, হ্যাম্‌লেট্‌ পুরানো কথা সব ভুলে গিয়েছে। তাই খেলা দেখতে দেখতে তাঁর মাতৃহৃদয় হ্যাম্‌লেটের শুভ কামনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। হ্যাম্‌লেট্‌কে জিততে দেখে তিনি আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন, "হ্যাম্‌লেট্‌, হ্যাম্‌লেট্‌ জিতছে!"

প্রথম পর্ব খেলার পর হ্যাম্‌লেট্‌ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রানী তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ওড়না দিয়ে হ্যাম্‌লেটের কপালের ঘাম মুছিয়ে দেন। হ্যাম্‌লেট্‌ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছেন মনে করে, রানী ক্লডিয়াসের দিকে চেয়ে বলেন, "হ্যাম্‌লেটের পানীয় দাও, হ্যাম্‌লেট্‌ তৃষ্ণার্ত।"

ক্লডিয়াস্‌ এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তাড়াতাড়ি বিষ-মাখানো পাত্রটি রানীর হাতে তুলে দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে খেলার বাজনা বেজে ওঠায়, হ্যাম্‌লেট্‌ তাড়াতাড়ি আবার মঞ্চের

দিকে এগিয়ে চলেন। রানী পাত্র নিয়ে এগিয়ে যান। কিন্তু হ্যাম্‌লেট্ প্রত্যাখ্যান করেন, এখন নয়···পরে···

রানী নিজে খেলা দেখার উত্তেজনায় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই পাত্রটি ফিরিয়ে না দিয়ে নিজে খেয়ে ফেললেন। ক্লডিয়াস্ বারণ করবার আগেই দেখেন সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। ক্লডিয়াস্ কল্পনাতেও ভাবেন নি, এই ব্যাপার এই রকম ভাবে ঘটে যাবে। আতঙ্কে ক্লডিয়াসের মুখের চেহারা বদলে যায়। অথচ মুখ ফুটে তিনি কিছু বলতে পারেন না।

ওধারে লিয়ার্টিস্ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ক্লডিয়াস্ উত্তেজনা বাড়াবার জন্য বাদ্যকারদের জোরে জোরে বাজাতে বলেন···এবং চোখের ইঙ্গিতে লিয়ার্টিস্‌কে জানিয়ে দেন, আর দেরি কোরো না!

লিয়ার্টিসের উত্তেজিত দেহ-মনে সেই ইঙ্গিত আরও উত্তেজনা এনে দেয়। লিয়ার্টিসের ক্ষীণ বিবেক ডুবে যায়। সুযোগ পেয়ে লিয়ার্টিস্ গভীরভাবে হ্যাম্‌লেটের অঙ্গে আঘাত করে।

হ্যাম্‌লেট্ চীৎকার করে ওঠেন, "এ কি হলো বন্ধু?"

অনুতাপের ভান করে লিয়ার্টিস্ শুধু বলে, "উত্তেজনার বশে ভুল হয়ে গিয়েছে!"

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই লিয়ার্টিস আবার সেই বিষমাখা তলোয়ার হ্যাম্‌লেটের দেহে চালিয়ে দেয়। হ্যাম্‌লেট্ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। ক্রুদ্ধ হয়ে তখন তিনি লিয়ার্টিস্‌কে সত্যিকার আক্রমণ করেন এবং গভীরভাবে তাকে আঘাত করেন।

হ্যাম্‌লেটের গায়ে রক্ত ঝরছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে বুঝে ক্লডিয়াস্ চীৎকার করে ওঠেন, "বন্ধ কর, বন্ধ কর খেলা!"

কিন্তু খেলা বন্ধ হওয়ার আগেই হ্যাম্‌লেট্ এক আঘাতে লিয়ার্টিসের হাত থেকে বিষাক্ত তলোয়ার ফেলে দিয়েছেন, আর সেই তলোয়ারখানাই তুলে নিয়ে সোজা লিয়ার্টিসের বুকে আঘাত করেছেন।

এমন সময় দর্শকদের ভিতর থেকে আর্তনাদ উঠলো···রানী··· রানী···মূর্ছা গিয়েছেন!

তখন রানীর দেহে বিষ-ক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। রানী বুঝতে পেরেছেন, যে-পাত্র তিনি হ্যাম্‌লেটের জন্যে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে পাত্রে বিষ ছিল। শেষ মুহূর্তে রানী চিৎকার করে উঠলেন, "না··· না···মূর্ছা নয়·· আমি মরছি···বিষ···বিষ···হ্যাম্‌লেটের পাত্রে বিষ ছিল হ্যাম্‌লেট্, আমি চললাম!"

হ্যাম্‌লেট্ অবাক্ হয়ে রানীর কাছে ছুটে যান···রক্ত ঝরা আহত দেহ নিয়ে লিয়ার্টিস্ বলে, "বন্ধু, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে তুমি আর আমি কেউই এই পৃথিবীতে থাকবো না···আমার পাপের শাস্তি আমি পেয়েছি···যে তলোয়ারে আমি তোমাকে আঘাত করেছি—তাতে বিষ মাখানো ছিল ··ঐ···ঐ···ক্লডিয়াস্···"

লিয়ার্টিসের দেহও অবশ হয়ে আসে।

হ্যাম্‌লেট্ এখন যেন সত্যিই উন্মাদের মতন। সেই বিষমাখা তলোয়ার তুলে নিয়ে তিনি সোজা ক্লডিয়াসের বুকে বসিয়ে দিলেন।

আর্তনাদ করে উঠলেন, "এই বিষ তুমিই ছড়িয়েছ···তোমাকেই ফিরিয়ে দিলাম!"

সঙ্গে সঙ্গে ক্লডিয়াস্ আর্তনাদ করে পড়ে যান। কয়েক মুহূর্ত পরে লিয়ার্টিস্‌ও। দুজনেরই দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল।

চারিদিকে মৃত্যু! চারিদিকে মৃত্যু! উৎসবক্ষেত্র যেন শ্মশান! সেই শ্মশানে দাঁড়িয়ে হ্যাম্‌লেট্ বুঝতে পারেন—এবার তাঁর নিজের পালা। তাঁর দেহ অবশ হয়ে আসছে, মৃত্যুর আর বিলম্ব নেই। চারিদিকে চেয়ে দেখেন, এই বিরাট বিশ্বে কেউ নেই তাঁর আপনার জন—শুধু একজন বন্ধু—হোরেসিও। হ্যাম্‌লেটের অবশ দেহ মাটিতে পড়ে যাচ্ছে দেখে হোরেসিও ছুটে এসে তাঁকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই হোরেসিওর কোলে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন হ্যাম্‌লেট্।

যাবার আগে বন্ধুকে শেষ কথা বলে গেলেন, "বন্ধু হোরেসিও, একমাত্র তুমি বেঁচে রইলে ডেনমার্কের হতভাগ্য যুবরাজের কাহিনী জগৎকে বলবার জন্যে!"

সমাপ্ত

●ছোটদের কাছে অতি লোভনীয় একটি সিরিজ●

[বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী বইগুলির সহজ সরল অনুবাদ]

* ভিক্টর হ্যুগো * চার্লস ডিকেন্স * জুলে ভার্নে * মার্ক টোয়েন
* এইচ. জি. ওয়েলস * রবার্ট লুই স্টিভেনসন * আলেকজাণ্ডার দুমা
* হোমার প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকদের বইয়ের অনুবাদ।

এ্যাক্রস দ্য পীরেনীজ	মিষ্ট্রি অব প্যারি
অব হিউম্যান বণ্ডেজ	ব্ল্যাক টিউলিপ, ব্ল্যাক অ্যারো
মাইকেল স্ট্রগফ, বেন হুর	জেন আয়ার
দি লাস্ট অব হি মহিক্যান্স্	সাইলাস মার্নার
অ্যাড্ভেঞ্চার অব মার্কোপোলো	মুন অব ইজরায়েল
কাউণ্ট অব মণ্টিক্রিষ্টো	নিকোলাস নিকোলবি
এলিসস এ্যাডভেঞ্চার ইন দি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড	উইণ্ডস ক্যাসেল
দ্য পাথ ফাইণ্ডার	হোয়াইট ফ্যাং
টম ব্রাউনস স্কুল ডেজ	গ্রেট এক্সপেক্টেশন
দ্য ম্যান্ হু লাফস্, অব হিউম্যান বণ্ডেজ	লর্নাডুন, মার্গারেট ডি ভ্যালয়
আংকল্ টম্স্ কেবিন	ক্যুয়ো ভাদিস, বটল ইম্প
দি ম্যান হু লাফস	ট্রেজার আইল্যাণ্ড, রবরয়
ইনভিজিব্ল্ ম্যান্, দ্য ট্যালিস ম্যান	ভ্যাগাবণ্ডস, জেন আয়ার
ট্র্যাজেডি অব সেক্সপিয়ার	থ্রী মাস্কেটিয়ার্স, মিডল মার্চ
সেক্সপিয়ারের কমেডি	কার্শিকান ব্রাদার্স, লাইট হাউস
দ্য লস্ট সিটি, রয়্যাল এসকেপ্	হাণ্ডব্যাক অব নোৎরদাম
দ্য ফোর জাষ্ট মেন	কোরাল আইল্যাণ্ড
দ্য লষ্ট ওয়ার্ল্ড, দ্য লাস্ট ফ্রন্টিয়ার	মাদার, দ্য হোয়াইট মাংকি
কাট্রিওনা ●দ্য লষ্ট কিং	ডেভিড কপারফিল্ড
ভাইকাউণ্ট দ্য ব্রাঁগেলো	ওডিসি ●ইলিয়াড
কল অব দ্য ওয়াইল্ড	ডন্ কুইক্সোট, ভাইকাউণ্ট দ্য ব্রাঁগেলো
ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন	হাইপেশিয়া ● দ্য ফেয়ার গড
	দ্য ব্রিজ অন দি ড্রিনা

●এছাড়া আরও নতুন নতুন বই বাহির হইবে●

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯